আজগুবি জানোয়ার

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কলিকাতা
সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার

প্রকাশক
শ্রীপ্রমথনাথ সেন, বি. এল্.
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রিণ্টার—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সূচী

১। আজগুবি জানোয়ার ... ...

২। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ ... ...

৩। জীবনের আদি জননী ... ...

৪। নির্ব্বংশ জীব-গোষ্ঠী ... ...

৫। মেরুতে ও মরুতে ... ...

৬। রাক্ষুসে বাদুড় .. ..

৭। অন্ধকারের জীব ...

৮। সত্যিকারের ড্র্যাগন ...

৯। ছাঁচের তফাৎ ..

কয়েকটি ছবির সূচী

নব-আবিষ্কৃত বানর	মুখপত্র
অক্টোপাস—সমুদ্রের ভয়ঙ্কর	৬
গরিলা —সাক্ষাৎ যম	১১
ালকায় পুরুষ গরিলা	১৯
জাতীয় 'সাপমুখী'	২২
ন 'দ্বিচঞ্চু'	২২
'কোদালমুখী'	২৫
শামলা'	২৭
াদিম অধিবাসী	৩১
... ...	৪১
বা ভয় পায় না	৪৬
... ...	৫৪
... ...	৬৪
... ...	৬৪
... ...	৬৯
... ...	৭২
.. ..	৮৩
... ...	৮৫
... ...	৮৭
... ...	৮৭
... ...	৮৯

নব-আবিষ্কৃত বানর

দক্ষিণ আমেরিকার গভীর জঙ্গলে এক অভিযানকারীকে আক্রমণ করতে গিয়ে এই লেজহীন বানরী মারা পড়ে. এ লম্বায় পাঁচ ফুটেরও বেশি

এক

আজগুবি জানোয়ার

এক হিসেবে সব জানোয়ারই আজগুবি, অবশ্য যদি তেমনভাবে দেখা যায়। যে দিক থেকে দেখা হচ্ছে তার ওপর কোনটা সাধারণ আর কোনটা অদ্ভুত ও আজগুবি তা নির্ভর করে।

আমাদের কাছে মানুষ কেন, বাঁদর গোরু ঘোড়া কিছুই অসাধারণ জানোয়ার নয়। কারণ শুধু যে আমরা তাদের সঙ্গে পরিচিত তা নয়, আমাদের সঙ্গে সে সব জানোয়ারের মিলও আছে প্রচুর। গোরু চার পায়ে হাঁটে, মানুষের সঙ্গে তার চেহারারও অনেক তফাৎ, কিন্তু তবু তার মাথাটা মাথার দিকে এবং পা'টা পায়ের দিকেই আছে। আমাদের মতই সে মুখ দিয়ে খায়, দাঁত দিয়ে চিবোয়—রোমন্থনটা তার একটু মজার বটে—এবং পেটের ভেতর পাকস্থলীতে হজম করে। তার গায়ের রক্তও লাল।

এসব কথা শুনলে মনে হ'তে পারে—এ আবার কি কথা, এ-রকম মিল তো সকলের সঙ্গেই আছে!

কিন্তু সত্যি তা নেই! মাথাটা মাথার দিকে নয়, এমন জানোয়ার সত্যি আছে। ছেলেবেলার গল্পের ভূতের মত, পেটের মধ্যে মাথাওয়ালা জানোয়ারও আছে। অবশ্য নিজেদের চোখ দিয়ে দেখছি বলেই সে জানোয়ারকে আমাদের উল্টো ধরণের এবং আজগুবি মনে হচ্ছে; কিন্তু যদি সেই জানোয়ারের চোখ নিয়ে দেখা যেতো তাহলে মানুষকেই আজগুবি মনে হ'ত না কি?

অক্টোপাসই ধরা যাক। যদি তারা সভ্য হয়ে মানুষকে বিচার করতে বসত, তাহলে তাদের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মানুষকে দেখে বলত, এ আবার

কি অদ্ভুত! এমন আজগুবি জানোয়ার তো দেখিনি! না আছে এর আটটা শুঁড়, আর না আছে এর মাথায় কোন পা! জলে না থেকে থাকে ডাঙায়! রক্ত আবার এদের লাল! মানুষের এই রকম কত ব্যাপারই তাদের কাছে অদ্ভুত আজগুবি লাগত!

সুতরাং মাথাটা কার যে ঠিক আছে, তা একেবারে নির্ভুলভাবে বলা অসম্ভব। তবে নিজের মাথাটাই সবাই যখন সবচেয়ে ঠিক ভাবে এবং এক্ষেত্রে তা ছাড়া যখন আমাদের আর কোন উপায়ও নেই, তখন মানুষের চোখ দিয়েই আমাদের সাধারণ ও আজগুবি জানোয়ারের বিচার করতে হবে।

আট শুঁড়ের মালিক অক্টোপাস

মানুষের চেহারা, মানুষের গড়ন-পেটনই হ'ল আমাদের মাপকাঠি, তাই দিয়েই আমরা অন্য জানোয়ারের হিসাব ধরব।

সেই রকম বিচার করতে গিয়ে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার আছে যাদের আমরা কল্পনা করতেই পারি না। আমরা না পারলেও এই সৃষ্টির সমস্ত প্রাণিজগৎ যাঁর নির্দ্দেশে চলেছে সেই প্রকৃতি ঠাকরুণ তা পেরেছেন। তাঁর কল্পনাশক্তি অসীম। প্রাণিজগতে কতরকম অদ্ভুত পরীক্ষা তিনি করেছেন, জানলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, এ যেন তাঁর খেয়ালের খেলা। নানারকম ভাবে নানা জীব তিনি গড়েছেন। কোনটাকে খানিক দূর খুব উৎসাহের সঙ্গে চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন,

আর একটাকে ধরবার জন্যে, কোনটাকে ভুলে গেছেন, কোনটাকে আবার একেবারে লুপ্ত ক'রে দিয়েছেন।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই যে পরীক্ষা তিনি চালিয়ে আসছেন, তাতে নানা অদ্ভুত জীব কেমন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কেমন ভাবে একটু একটু ক'রে তারা বদলেছে, কেউ কেউ কেমন ক'রে আবার গেছে তার কাহিনী অপরূপ।

সে কাহিনী এখানে আজ বলবার নয়। আপাতত তাঁর কল্পনার বিরাট খেলাঘরে যে সব প্রাণীর অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে তাদেরই কয়েকটির কথা বলা হবে। তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্যও অসীম। প্রকৃতি ঠাকরুণের হাতে কত অদ্ভুত ধরণের যে জীব বেরিয়েছে তার লেখা জোখা নেই।

অক্টোপাসের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তাদের কথাই ধরা যাক। আজগুবি ছাড়া আর তাদের কি বলা যায়! প্রকৃতির তারা এক অদ্ভুত পরীক্ষা। তারা হ'ল শামুক গুগলি ঝিনুকের দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি। মানুষ এবং পৃথিবীর স্থলভাগের জানোয়ারদের শরীরের শক্ত অংশ অর্থাৎ হাড় থাকে ভেতরে। ঝিনুক-শামুকের বেলায় হাড়ের অংশ চর্মের মত বাইরে রাখলে কি হয়, প্রকৃতি ঠাকরুণ তাই দেখছিলেন। আমাদের ওপরে নরম মাংস ভেতরে হাড়; তাদের ওপরে শক্ত খোলস ভেতরে নরম মাংস। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি খুব সন্তুষ্ট হননি; কারণ ঝিনুকদের জাতের যারা সব চেয়ে বড় ঘর, সেই অক্টোপাস প্রভৃতির বেলায় বাইরের খোলসটাকে ক্রমে ক্রমে লোপ ক'রে দিয়ে মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর মত অনেকটা ভেতরে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অক্টোপাস আমাদের কাছে বিস্ময়কর জানোয়ার। আমাদের তুলনায় তার সব কিছু অদ্ভুত।

অক্টোপাস কথাটার অর্থ জানলেই তা বোঝা যাবে। অক্টোপাসের

বাংলা মানে হ'ল 'মাথায় যার পা আছে'। পা ত ঠিক নয়, সাপের মত লিকলিকে আটটি শুঁড় মুখের ধার থেকে বেরিয়েছে। ঐগুলি দিয়ে সে শিকারকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এইখানেই তার আমাদের সঙ্গে গরমিল শেষ নয়।

অদ্ভুত আচরণ

দাঁত দিয়ে চিবিয়ে পেটের মধ্যে হজম করার কথাটা সবাই জানে। কিন্তু অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণী শরীরের ভেতরে নয়, শরীরের

অক্টোপাস—সমুদ্রের ভয়ঙ্কর

বাইরে তাদের হজম করার কাজটা সারে। শিকার ধ'রে তারা বাজপাখীর ঠোঁটের মত বাঁকা ও ধারালো দাড়ায় তাকে কেটে ফেলে। তারপর অক্টোপাস শরীরের ভেতর থেকে হজমী রস বা'র ক'রে সেই শিকারের

গায়ে ঢুকিয়ে দেয়। সেই রসে বাইরে হজম হ'য়ে শিকারের গা থেকে যে রস বেরোয় সেইটে অক্টোপাস শুষে নেয়।

এই ধরণের হজম করার রীতি অক্টোপাসের একচেটে নয়। আমাদের গলদা চিংড়ি জাতীয় প্রাণীও এইভাবে শরীরের বাইরে হজম করে।

আর একটা মজার জিনিষ এদের বেলায় লক্ষ্য করার মত। রক্তের রঙ তো আমরা লাল ছাড়া কিছু ভাবতেই পারি না। বিলাতী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোককে নীল রক্তের বলা হয়। কিন্তু সে শুধু কথার কথা। আমাদের সাধারণত যে সব জানোয়ারের সঙ্গে পরিচয়, পাখি থেকে মাছ পর্য্যন্ত, তাদের সবার রক্তই লাল। কিন্তু অক্টোপাসদের রক্ত হ'ল সত্যিকারের নীল। চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতির সঙ্গে এ-বিষয়ে তার মিল আছে।

অক্টোপাসদের সম্বন্ধে আর একটু কিছু এখানে বোধ হয় বলা দরকার। মেরুদণ্ড-ওয়ালা প্রাণীরাই পৃথিবীতে আজ সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে। তাদের সব জায়গায় জয় জয়কার। প্রকৃতি ঠাকরুণ আর যে সব পরীক্ষা করেছেন, এই পরীক্ষার কাছে সেগুলি হার মেনেছে। কিন্তু মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মধ্যে এই অক্টোপাসের জাতিই একমাত্র তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তারা সত্যিই আশ্চর্য্য রকম উন্নতি করেছে বলা যায়।

অক্টোপাস সমুদ্রের তলায় পাথরের কোণে কাণাচে জলের গুহার ধারে বাস করে। সেই তার শিকার ধরবার আড্ডা। অনেক সময় সমুদ্রের তলায় পাথর-টাথর দিয়ে তারা বাসা পর্য্যন্ত তৈরী করে। তাদের চোখ দস্তুরমত উন্নত ধরণের। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মধ্যে অত ভালো চোখ আর কারুর দেখা যায় না। তাদের চালচলন স্বভাব দেখে মনে হয়, উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের মত তাদের অনুভূতি আছে নানা রকমের।

অক্টোপাসেরই জাতের একটি প্রাণী আছে, তাকে অক্টোপাসের বড় ভাই বলা যায়। অক্টোপাসের শুঁড় থাকে মাত্র আটটি, আর এই কাট্‌ল্

ফিশ্ ও স্কুইডের থাকে দশটি। কাট্‌ল্ ফিশ্ অক্টোপাসের চেয়ে আকারেও অনেক বড় হয়। পঞ্চাশ ফুট আকারের কাট্‌ল্ ফিশ্‌ও আছে। কাট্‌ল্ ফিশের ভারী একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বহুরূপী যেমন নিজের রঙ আবেষ্টনের মত ক'রে বদলাতে পারে, কাট্‌ল্ ফিশ্‌ও তাই। এছাড়া আজকালকার যুদ্ধ-জাহাজ যেমন ধোঁয়া ছেড়ে আকাশ অন্ধকার ক'রে তার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যায়, কাট্‌ল্ ফিশ্‌ও সেই রকম জলের ভেতর এক রকম রঙ ছেড়ে দিয়ে বিপদ বুঝলে শত্রুর হাত থেকে পালায়।

কাট্‌ল্ ফিশ্—সমুদ্রের বহুরূপী

অক্টোপাসের ধরণ-ধারণও তবু খানিকটা বোঝা যায়। সমুদ্রের আর একটি প্রাণী কিন্তু আমাদের বুঝি ধারণার বাইরে। সমুদ্রের তারামাছের কথা বলছি—প্রকৃতি ঠাকরুণের এ এক অদ্ভুত খামখেয়ালী পরীক্ষা। অন্য কত জানোয়ার, এমন কি পোকা-মাকড়কে আমরা বোধ হয় চেষ্টা করলে খানিকটা বুঝতে পারি। তাদের সামনা পেছন আছে। তাদের মাথা, পা, পেট, আলাদা। কিন্তু এই তারামাছের না আছে ডান বা

বাঁ, না আছে সামনা আর পেছন। হঠাৎ কি খেয়ালে এরা পাঁচকোণা হয়ে গেছে। সব কোণ থেকেই এরা সমান। পাঁচ কোণে এঁদের পাঁচটি পা মাঝখানের একটি চাকতির সঙ্গে জোড়া। সে চাকতির নীচের দিকটা হ'ল মুখ, ওপর দিকটা শরীরের মলদ্বার। পাঁচ পায়ে এরা সমুদ্রের তলায় আহারের খোঁজে যে দিকে খুশী চ'লে বেড়ায়—কারণ সব দিকই তার সমান। পাঁচ পা বলাটা ঠিক হ'ল না, কারণ পা তো নয়, এগুলি চলার সাহায্য করলেও আসলে হ'ল তারামাছের পেট। মুখ দিয়ে যা খায়, তা এই পায়ের ভেতর গিয়ে তারামাছের হজম হয়। চলার কৌশলও এর মজার। প্রত্যেক পেট ও পায়ের তলায় এদের অসংখ্য ছোট ছোট নল আছে দু'ধারে। সেগুলি একবার জলে ভর্ত্তি হয়ে যায়, আবার জল তা থেকে বেরিয়ে যায়। এইভাবে সেগুলি নড়াচড়ার ফলে তারামাছ চলাফেরা করে।

স্কুইড

এরা আট্‌লান্টিক মহাসাগরের অধিবাসী
শুঁড় নিয়ে লম্বায় ৫০ ফুট পর্যন্ত হয়

আমরা বিনয়ের পরাকাষ্ঠায় নিজেদের কীটাণুকীট ভাবতে পারি, কিন্তু তারামাছ হিসেবে বোধ হয় পারি না। সামনা পেছন, ডান বাঁ

যদি লোপ পেয়ে যায়, আর পায়ের মধ্যে যদি হজম করতে হয়, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়ায় বলত!

এ সব গেল প্রাণিজগতে প্রকৃতি ঠাকরুণের আজগুবি কল্পনার পরিচয়। এ সব প্রাণী আমাদের থেকে একেবারে ভিন্ন ধাঁচে তৈরী। তাদের ধাঁচটাই আমাদের কাছে বিস্ময়কর। এ রকম আজগুবি জানোয়ার আরো অবশ্য অনেক আছে। এখানে তাদের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

গরিলা—সাক্ষাৎ যম

দুই

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ

বন-মানুষের কথা

চিড়িয়াখানায় গেলে ছেলেদের সব চেয়ে ভিড় বোধ হয় দেখা যায় ওরাংওটাং-এর আস্তানার কাছে। এমন মজার জানোয়ার আর নেই। সার্কাসের পেশাদার ভাঁড়কেও তারা দু'চারটে কায়দা বোধ হয় শিখিয়ে দিতে পারে। বুড়ো মানুষের মত গম্ভীর মুখে তারা সারাদিন যে সব মজার কাণ্ড করে, তাতে হাসি চেপে রাখা অত্যন্ত শক্ত। মানুষের চেহারার সঙ্গে তাদের মিল আছে ব'লেই তাদের খেলায় এত বেশি আমোদ পাওয়া যায়। বাঁকা বাঁকা পায়ে টলমল ক'রে ঘুরে ফিরে তারা যখন নানা অদ্ভুত মজা করে, তখন মনে হয় কোন মানুষই যেন এমনি ক'রে সেজে সকলকে হাসাবার চেষ্টা করছে।

ওরাংওটাং বা বন-মানুষ দাঁড়িয়ে আছে

মানুষের সঙ্গে তাদের এই মিলের জন্যই ওরাংওটাং-এর নাম বন-

মানুষ দেওয়া হয়েছে। বন-মানুষকে সাধারণত বানর ব'লে মনে হ'লেও তারা সগোত্র নয়। বন-মানুষ আর বানরে যে তফাৎ আছে, তা একটু ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়। বন-মানুষের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাদের লেজ নেই। বানরের মত শুধু লেজের অভাব নয়, আরো অনেক পার্থক্য আছে। মানুষের মত আকার হ'লেও বানরেরা সাধারণত চার হাত পায়ে চলা-ফেরা করে। কিন্তু বন-মানুষ চলা-ফেরার জন্যে এক সঙ্গে হাত-পা ব্যবহার করে না; তারা শুধু পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারে।

যাদের 'উকু' বলা হয়, চিড়িয়াখানায় সেই 'গীবন' জাতীয় বন-মানুষের খাঁচার কাছে গেলেই তাদের এই বিশেষত্ব বুঝতে পারা যাবে।

বাঁ দিক থেকে পর পর—গীবন, ওরাং, শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও মানুষের কঙ্কাল

'উকু' আর ওরাংওটাং ছাড়া পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আরও দু'জাতের বন-মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে—শিম্পাঞ্জি এবং গরিলা; এরাও বন-মানুষেরই দু'টি শ্রেণী।

উকু বা গীবন আর ওরাংওটাং আমাদের এদিকেরই বাসিন্দা। বর্ম্মা ও মালবের জঙ্গলে, বোর্ণিওতে, জাভায় ও সুমাত্রায় গীবন দেখা যায়। বন-মানুষদের ভেতর এরাই সব চেয়ে আকারে ছোট। সব চেয়ে বড় জাতের গীবনও ওজনে পোনেরো সেরের বেশি হয় না। কিন্তু ছোট

হ'লেও সমস্ত বন-মানুষের ভেতর সাধারণত এই জাতির বন-মানুষই সোজা হ'য়ে হাঁটে। ছোট বড় প্রায় দশ রকমের গীবনের খবর পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় জাতের নাম হ'ল সিয়ামাং। মালবের দক্ষিণ আর সুমাত্রায় এদের বাস। গীবনের মত এমন চটপটে চঞ্চল জানোয়ার আর একটি নেই। জঙ্গলের ঘন গাছপালার মধ্যে বিদ্যুতের মত তারা ডাল থেকে ডালে দোল খেয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে। হাতগুলি এদের অসম্ভব রকম লম্বা, আর জোরও অসাধারণ। জঙ্গলের তারা সব চেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়; এক লাফে ছাব্বিশ সাতাশ হাত পার হ'য়ে যাওয়া, তাদের কাছে এমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়।

গীবন যেমন চটপটে ও চঞ্চল, ওরাংওটাং তেমনি গম্ভীর। চেহারায় যেমন বুড়ো মানুষের মত, কাজেও তারা তেমনি। দৌড়-ঝাঁপ ছুটোছুটি তাদের ধাতে নেই। তারা বেশির ভাগ গাছে থাকে, মাটিতে নামে কদাচিৎ। বন-মানুষের ভেতর ওরাংরাই সব চেয়ে নিরীহ ও শান্ত।

বোর্ণিওর পশ্চিমে আর সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিমের ঘন জঙ্গলেই ওরাংওটাং-এর বাস। সবশুদ্ধ এই দুই জঙ্গলে হাজার চল্লিশ ওরাং আছে কিনা তাও সন্দেহ। এ সংখ্যাও ক্রমশ ক'মে আসছে।

জন্মাবার সময় ওরাং-এর বাচ্চার ওজন মানব-শিশুর ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ থাকে মাত্র, কিন্তু ধাড়ী ওরাং ওজনে আড়াই মণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। চৌদ্দ বৎসরে ওরাং জোয়ান হয়ে ওঠে, বাঁচে চল্লিশের কিছু বেশি। বুড়ো মদ্দা ওরাং দেখলেই চেনা যায়। তাদের গলায় দু'ধারে থলির মত মাংসের এক রকম পুঁটুলি হয়।

ওরাংরা গাছের ওপর ডাল-পালা দিয়ে মাচা তৈরী করে শোয়ার জন্যে। শিম্পাঞ্জি ও গরিলার মত এদেরও শোয়ার অভ্যাস মানুষের মত। দাঁড়িয়ে বা ব'সে অন্য জানোয়ারের মত এরা ঘুমোতে পারে না।

মাচা তৈরীতে ওরাংরা অত্যন্ত পটু। একবার লণ্ডনের চিড়িয়াখানা থেকে একটা ধাড়ী ওরাং কোন রকমে পালিয়ে যায়। আধ ঘণ্টা বাদে তার খোঁজ যখন পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই কাছের একটি গাছে সে বেশ একটি মজবুত মাচা তৈবী ক'রে তার ওপর ব'সে আছে।

গীবন এবং ওরাং ছাড়া পৃথিবীর আর দু'জাতের বন-মানুষের বাস আফ্রিকায়। বিষুব-রেখাকে অনুসরণ ক'রে পশ্চিমের সিয়েবা-লিয়োন থেকে পূর্ব্বের হ্রদ-প্রদেশ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় একটি গহন দুর্ভেদ্য অরণ্য বিস্তৃত। এ অরণ্য প্রায় তিন হাজার মাইল লম্বা ও স্থান-বিশেষে তিন শত থেকে আট শত মাইল চওড়া। সভ্য মানুষ এই গভীর অরণ্যের সব রহস্য এখনও জানতে পারেনি। এই অরণ্যই গরিলা ও শিম্পাঞ্জির বাসস্থান। আয়তনে এই অরণ্য সমস্ত ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি হ'লেও তাতে সবশুদ্ধ সওয়া লক্ষের বেশি শিম্পাঞ্জি নেই ব'লে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন।

শিম্পাঞ্জিরা এক একটি পরিবার একত্র হ'য়ে এক সঙ্গে বাস করে। নানা বয়সের পুরুষ মেয়ে মিলিয়ে বারো থেকে চল্লিশটি শিম্পাঞ্জিকে এক পরিবারে দেখা যায়।

শিম্পাঞ্জিকে বন-মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলা হয়। অত্যন্ত সহজে মানুষের পোষ মেনে মানুষের চাল-চলনের অনুকরণ করতে তার জুড়ি নেই। শিক্ষিত শিম্পাঞ্জিদের মানুষেব মত নানা বুদ্ধির কাজ করার কথা আমরা জানি।

মস্তিষ্কের ওজন থেকে শিম্পাঞ্জির এ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। গরিলা ও ওরাং-এর আকার ও মস্তিষ্কের ওজন শিম্পাঞ্জির চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু সে যাই হোক, শিম্পাঞ্জির মত এমন আমুদে ফুর্ত্তিবাজ

জানোয়ার আর নেই। ওরাং-এর তুলনায় সে ঢের বেশি চটপটে ও মিশুক ব'লে মানুষের কাছে তার আদর অনেক বেশি।

শিম্পাঞ্জি ওজনে প্রায় মানুষেরই সমান। দেড় মণ থেকে সওয়া দু'মণ সাধারণত তাদের ভার। মাথায় কিন্তু সাড়ে চার ফুটের উঁচু তারা হয় না। শরীরের ওপরের অংশের তুলনায় তাদের পায়ের দিক বেশ হ্রস্ব।

বন-মানুষের রকম ফের—শিম্পাঞ্জি

শিম্পাঞ্জির ছানাও ওরাং-এর মত জন্মাবস্থায় অত্যন্ত ছোট থাকে। প্রথম বছরখানেক মাতৃস্তন্যই তাদের একমাত্র আহার। মানুষের শিশুর মত তাদের ছ' মাসে প্রথম দাঁত ওঠে না, ওঠে দু' মাসেরই ভিতর। দুধে-দাঁত প'ড়ে গিয়ে মানুষের শিশুর আসল দাঁত উঠতে আরম্ভ হয় প্রায় ছ' বছর বয়সে, কিন্তু শিম্পাঞ্জির নতুন দাঁত চার বছরেই উঠতে থাকে। শিম্পাঞ্জি ও মানুষের দাঁত সংখ্যায় ও বৈশিষ্ট্যে এক।

শিম্পাঞ্জি-বাচ্চাকে বছর চারেকের হ'লেই স্বাধীনভাবে নিজের দায় নিজেকে সামলাতে হয়। পোনেরো বছর বয়সে সে জোয়ান হয়। ওরাং-এর মত চল্লিশ বছরেই সে বেশ বুড়ো হয়ে পড়ে, প্রায় সত্তর বছরের মানুষের সমান।

বন-মানুষের ভেতর সবচেয়ে বৃহত্তম ও রহস্যময় হচ্ছে গরিলা। অন্যান্য বন-মানুষের কথা সভ্য-জগতে অনেক দিন আগেই কিছু কিছু

জানা ছিল। কিন্তু গরিলা সেদিন পর্য্যন্ত একেবারে অজ্ঞাত ছিল। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের বিশাল বিভীষিকা রূপে এই প্রাণীটি অনেক আজগুবি গল্পের খেয়াল জুগিয়েছে। সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে গরিলা সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কাহিনী শিকারীরাও প্রচার করেছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ স্যাভেজ নামে একজন মার্কিন পাদ্রী ফরাসীদের শাসনাধীন আফ্রিকার গাবুন প্রদেশে পর্য্যটনের সময় গরিলার অস্তিত্ব প্রথম সভ্য-জগতের গোচর করেন, কিন্তু গরিলা তখনও আজগুবি জানোয়ার বিশেষ। বিশাল আকার, তার বাসস্থানের দুর্গমতা, সমস্ত মিলে তার চারধারে এমন রহস্যজাল বিস্তার ক'রে দিল যে, বন্দুক নিয়ে যে-সমস্ত শিকারী তার সম্মুখীন হ'বার সাহস করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ পেয়েও তার সঠিক সংবাদ আনতে পারেননি। নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁদের বিবরণ সাধারণ কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে।

অবশ্য এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলবার আছে। বন্দুক হাতে লক্ষ্যভেদই করা সম্ভব, কিন্তু কোন প্রাণীর জীবনযাপনের রহস্যভেদ তার দ্বারা করা যায় না। তার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বন প্রয়োজন।

ধীরে ধীরে আধুনিক কালের জীব-বিজ্ঞানবিদেরা সেই পদ্ধতির সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন। নিরীহ বা হিংস্র কোন জানোয়ারকে আজকাল তাঁরা শুধু শিকার করতে বা'র হ'ন না। দুর্ভেদ্য অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে সেই প্রাণী নিজের আবেষ্টনে কিভাবে জীবনযাপন করে, তাই লক্ষ্য করাই এখন তাঁদের উদ্দেশ্য। এই ভাবেই তাঁরা আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গরিলাকে দেখবার চেষ্টা করেন প্রথম ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্যু চাইল্যু। তারপর অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে নিজেদের জীবন নানাভাবে বিপন্ন ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্যময়

অতিকায় প্রাণীটির সাধারণ অরণ্য-জীবনযাত্রার অনেক কথা জানতে পেরেছেন।

গরিলা সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের প্রধান বাধা এই যে, আফ্রিকার বিষুব-রেখার দু'ধারের অরণ্যের যে যে অংশে তারা বিচরণ করে, সে অংশের চেয়ে দুর্গম, অস্বাস্থ্যকর ভয়ঙ্কর স্থান পৃথিবীতে আর নেই বল্‌লেই হয়। আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীরাও সে সমস্ত স্থান এড়িয়ে চলে।

দেখতে যত ভীষণই হোক, গরিলা কিন্তু সাধারণত হিংস্র নয়। নেহাত উত্যক্ত না হ'লে সে আক্রমণ করে না। কিন্তু একবার সে ক্ষেপে গেলে আর রক্ষা নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর চেয়ে সে তখন ভয়ঙ্কর। কি যে শক্তি তার বিশাল দেহে, অস্ত্র হিসেবে তার তীক্ষ্ণ দাঁত যে কি ভয়ঙ্কর, তার ক্রোধ যে কি পৈশাচিক, তার পরিচয় তখনই পাওয়া যায়। তার পরিবারের কেউ বিপন্ন হ'লে গরিলা পালাতে জানে না। এ সময় তার প্রাণের ভয় একেবারেই থাকে না।

শিম্পাঞ্জির মত গরিলাও সপরিবারে বাস করে। কিন্তু তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি নয়। এক একটি পরিবারে আট দশটির বেশি থাকে না। বিশালকায় প্রবীণ একটি গরিলার নেতৃত্বেই সমস্ত পরিবার চলা-ফেরা করে। দু'একটি জোয়ান গরিলা এই নেতার সাকরেদী করে। ছোট ছোট বাচ্চা, তিন চারটি মেয়ে-গরিলা সমস্ত দলেই দেখা যায়। সারাদিন তারা আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। বাঁশের নরম কোঁড়, নানারকম রসাল মূলই তাদের প্রধান খাদ্য। আহার সম্বন্ধে তাদের কোনরকম সৌখীনতা নেই। তাদের প্রয়োজন শুধু প্রচুর খাদ্যের। তারা আফ্রিকার অসভ্যদের চাষের জমিতেও মাঝে মাঝে হানা দেয় আহারের সন্ধানে। কলাগাছের কচি চারা ও আক তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। রাত্রে কোন গাছের তলায় ডাল-পালা বিছিয়ে ধাড়ী গরিলা

তার শয্যা তৈরী করে। পরিবারের অন্যান্য গরিলারা কাছাকাছি গাছের উপর মাচা তৈরী ক'রে ঘুমোবার আয়োজন করে। অন্যান্য গরিলারা সে জায়গা থেকে বেশি দূরে কখনও যায় না।

বিশালতায় গরিলার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না সাধারণ একটি গরিলা ওজনে আড়াই থেকে তিন মণ পর্য্যন্ত হয়। বিখ্যাত শিকারী মিঃ বার্নস্ কিভূ হ্রদের কাছে আগ্নেয়-পর্ব্বতের অরণ্যে সবচেয়ে বিশালকায় একটি পুরুষ গরিলা শিকার করেন। দশ জন বলিষ্ঠ, অসভ্য কাফ্রী সেটাকে বয়ে আনতে হয়রাণ হয়ে গিয়েছিল। তার ওজন ছিল পাঁচ মণের বেশি।

বিশালকায় পুরুষ গরিলা

গরিলার দৈর্ঘ্য কিন্তু ওজনের তুলনায় খুব বেশি হয় না। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফুটই সাধারণত তাদের দৈর্ঘ্যের সীমা। ছ'ফুট লম্বা গরিলা একরকম বিরল।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, গরিলা ও শিম্পাঞ্জি প্রাণিজগতের একই মূল-ধারার দুইটি শাখা। কোন সুদূর অতীতে এক ধারা থেকে বা'র

হলেও তারা এখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শরীরের বিশালতা ও শক্তিবৃদ্ধির দিকেই গরিলার বিবর্ত্তন হয়েছে। জোয়ান পরিণতবয়স্ক একটি গরিলার কাছে আমাদের সব চেয়ে বড় পালোয়ানও নগণ্য। সাধারণ একটি গরিলা পাঁচজন বলিষ্ঠ মানুষকে কাবু করতে পারে।

শরীর বিশাল হ'য়ে পড়ার জন্যেই গরিলাকে গাছের ডালের স্বাভাবিক আশ্রয় ত্যাগ ক'রে বেশির ভাগ মাটির ওপর কাল কাটাতে হয়। বড় বড় ধাড়ী গরিলার চলা-ফেরার পক্ষে কোন গাছের ডালই বিশেষ নিরাপদ নয়।

অন্যান্য বন-মানুষের মত গরিলা-শিশু জন্মায় অত্যন্ত ছোট হ'য়ে। মানুষের শিশুর প্রায় অর্দ্ধেক তার ওজন। শিশু গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন। শুধু নাক আর দাঁতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাদের তফাৎ করা যায়। গরিলার নাকের ছিদ্র একটু বড়, নাকের ছিদ্রের ধারগুলিও অপেক্ষাকৃত উঁচু। নাকের সেই উঁচু-কাণা ওপরের ঠোঁটের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। সেই গরিলার দাঁত কিন্তু সমস্ত বন-মানুষ থেকে একেবারে আলাদা। নীচের ও ওপরের কুকুর-দাঁতগুলি তাদের যেমন বড়, তেমনি তীক্ষ্ণ। শিম্পাঞ্জির চেয়ে গরিলার কাণ অনেক ছোট, সেগুলি ছড়ানও নয়।

শিম্পাঞ্জির ছানার আর গরিলার ছানার একই সময়ে দাঁত ওঠে, তারা সাবালকও একই বয়সে হয়। কিন্তু গরিলা বেড়ে ওঠে অনেক তাড়াতাড়ি। সাধারণত গরিলার গায়ের লোম কালো, তাতে লালের আভাষ একটু পাওয়া যায়। বুড়ো গরিলার চুল মানুষের মত সাদা হ'তে দেখা যায়।

গরিলার সঙ্গে শিম্পাঞ্জির আর একটি তফাৎ প্রকৃতির দিক দিয়ে। শিম্পাঞ্জি যেমন আমুদে, গরিলা তেমনই গম্ভীর। বাচ্চা গরিলাকে ধ'রে

রেখেও দেখা গিয়েছে, তাদের ভেতর চঞ্চলতা নেই বললেই হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাদের চাল-চলন গম্ভীর, আত্মস্থ। সহজে সে মিশতে চায় না কারুর সঙ্গে।

গরিলাকে বুদ্ধিতে শিম্পাঞ্জির চেয়ে হীন ব'লে যে ধারণা করা হয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক তার প্রতিবাদ করেন এই ব'লে যে, শিম্পাঞ্জি মিশুক, সুতরাং তার বুদ্ধিবৃত্তি নিরূপণ করবার যে সুবিধা আছে গরিলার বেলায় তা নেই। গরিলা বন্দী অবস্থায় যেন অপমানে একেবারে মুষড়ে থাকে। সহজে মানুষের অনুসন্ধানে সাড়া দেয় না। সেইজন্যই তার বুদ্ধি সম্বন্ধে ভুল ধারণা গড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া বন্দী অবস্থায় গরিলাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত। সভ্যতার সংস্পর্শে এলেই, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও, তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ যে রোগ তাদের কাল হ'য়ে দাঁড়ায় সে হ'ল যক্ষ্মা।

তার নিজের দেশেও গরিলা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। সমস্ত আফ্রিকায় বর্ত্তমানে চল্লিশ হাজার গরিলাও আছে কিনা সন্দেহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ড্যু চাইল্যু চার বৎসর ধ'রে প্রায় আট হাজার মাইল গরিলার খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়েও সতেরোটির বেশি প্রাণী তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি। তারপর থেকে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষের বসতি-বিস্তারের সঙ্গে জঙ্গল চারধার দিয়ে যত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছে, গরিলা প্রভৃতি প্রাণীর পক্ষে জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকা ততই কঠিন হ'য়ে পড়ছে।

এখন বেলজিয়ান কঙ্গোতে গরিলা-শিকার আইন ক'রে বন্ধ করা হয়েছে। তাদের বিচরণ-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ও সুরক্ষিত। সেখানে বৈজ্ঞানিকেরাও এখন সরকারী অনুমতি ছাড়া যেতে পারেন না। কিন্তু তবু তাদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা যাবে কিনা সন্দেহ।

যুগান্তকাল ধ'রে যারা গহন অরণ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর ছিল, লাঞ্ছিত হ'য়ে মানুষের অনুগ্রহে তারা যেন আর বাঁচতে চায় না।

শুধু গরিলা নয়, বন-মানুষের সমস্ত জাতিই আজ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। জীবজগতে মানুষের পূর্ব্বের ধাপের এই প্রাণীগুলি লুপ্ত হবার পর আমাদের সুদূর রহস্যময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার কোন সাক্ষী আর থাকবে না।

বাইন্ জাতীয় 'সাপমুখী'

সাগরজলে প্রায় এক মাইল নিচে এরা বাস করে

এদের দাঁতগুলো সাঙ্ঘাতিক

মৎস্যকুলে '।

কাদাখোঁচা জাতীয় ঠোঁট ; মাইলখানেক নিচে

সাগরজলের অধিবাসী

তিন

জীবনের আদি জননী

সমুদ্রের কথা

সমুদ্র সম্বন্ধে কৌতূহল নেই এমন লোক বোধ হয় চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্র যারা দেখেছে আর এখনো সে সৌভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত, সকলেরই আছে তার প্রতি সমান টান। ডাঙা থেকে আলাদা, অন্য এক জগৎ ব'লেই যে সমুদ্রের প্রতি আমাদের এই আকর্ষণ তা মনে করোনা। সমুদ্রের আকর্ষণের আরো গূঢ় কারণ আছে। 'হে আদি জননী সিন্ধু' শুধু কবিতার উচ্ছ্বাস নয়, একান্ত সত্য কথা। সত্যই পৃথিবীর প্রথম প্রাণ-শক্তির আরম্ভ হয়েছিল সমুদ্রে। সেখান থেকে জীবন ধীরে ধীরে ডাঙায় উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও সমুদ্রকে আমরা ছাড়িয়ে আসতে পারিনি। সমুদ্র আছে আমাদের রক্তে। জীবতত্ত্ব-বিদেরা দেহের রক্ত ও সমুদ্রের জলের তুলনামূলক পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, দুইএর ভেতর একই ধরণের লবণাক্ত জল আছে। এই দু'রকমের জলে নানারকম লবণ জাতীয় জিনিষের পরিমাণও এক। সমুদ্রের জলই সমস্ত রক্তের ভিত্তি।

সে সুদূর সমুদ্র-বাসের স্মৃতি এখনও আমাদের শরীরে আছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সেই আদিম সমুদ্রের টানই আমাদের দেহে আমরা টের পাই। শুধু স্মৃতি নয়, সামুদ্রিকতার সমস্ত চিহ্ন এখনও আমরা লোপ করতে পারিনি। শিশু যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তখন গোড়ার

দিকে তার ঘাড়ের দু'ধারে মাছের কাণকোর মত দু'টি জিনিষ দেখা যায়। সে কাণকো লোপ পায় তার পরে। বাতাস থেকে নয়, জল থেকেই যে একদিন আমাদের অক্সিজেন নিতে হ'ত, এটা হ'ল তারই প্রমাণ।

কিন্তু সে যাই হোক সমুদ্র থেকে আমরা এখন অনেক দূরে স'রে এসেছি। সমুদ্রের প্রতি আমাদের টান যতখানি আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততখানি নেই। পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। জাহাজে ক'রে আমরা সমস্ত সাগরে পাড়ি দিচ্ছি অনেক দিন থেকে, কিন্তু সে শুধু তার 'খোসা'র ওপর দিয়ে বলা যেতে পারে। সমুদ্রকে শুধু ওপর থেকেই তো জানা যায় না! অতল তার গভীরতা। এভারেষ্ট চূড়াকে ডুবিয়ে দিয়েও থই পাওয়া যায় না এমন গভীর স্থানও আছে আমাদের এই পশান্ত মহাসাগরে। সে গভীর স্তরের কথা ওপর থেকে জানবার চেষ্টা করা বৃথা।

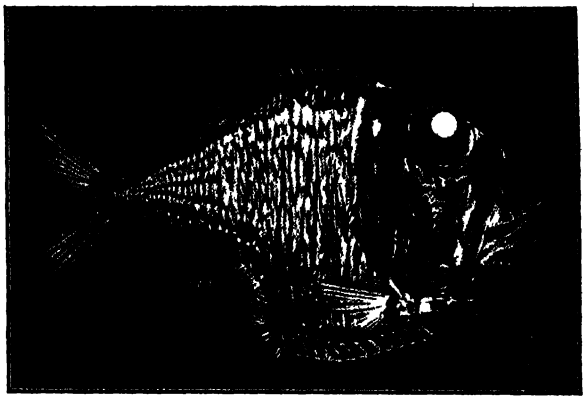

সাগর-তলায় 'কোদালমুখী'
(গভীর জলের মাছ)

তবু ওপর থেকেই সমুদ্রের কম বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না! বিষুব-রেখা থেকে আরম্ভ ক'রে দুই মেরু পর্য্যন্ত সমুদ্র নানা রূপে বিস্তৃত হ'য়ে আছে। তার বিভিন্ন শীতল ও উষ্ণ স্রোতের ধারার জটিলতা, তার নানামুখী বায়ুপ্রবাহের বিভিন্ন গতির রহস্য বড় কম নয়। উষ্ণ প্রদেশ থেকে শীতল মেরু পর্য্যন্ত প্রাণিজগতের পরিবর্ত্তনও অনুসরণ করবার মত।

কিন্তু সমুদ্রের গভীরতাকে না জানলে তাকে সত্য ক'রে জানা হয় না। ডাঙার সঙ্গে সমুদ্রের তফাৎ এই যে, ডাঙায় বলতে গেলে জীবনযাত্রার রঙ্গমঞ্চ এক রকম একতলাতেই সম্পূর্ণ। পাখি যত ঊর্দ্ধেই উঠুক আর সাপ যত নিচেই গর্ত্ত করুক, মাটির ওপরের একটি স্তরেই তাদের জীবন আবদ্ধ। কিন্তু সমুদ্রের জীবন-রঙ্গমঞ্চ অনেকগুলি তলায় ভাগ করা। সে সমস্ত তলায় যারা বাস করে, অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে তারা এক সমান স্তরে মিলতেই পারে না। এক তলার প্রাণীর আর এক তলায় যাবারই ক্ষমতা নেই। নিজের নিজের স্তরের জলের চাপের সঙ্গে তাদের শরীরের সামঞ্জস্য আছে। সে স্তর ছাড়িয়ে নিচে তারা নামতে পাবে না, ওপরে উঠলেও সর্ব্বনাশ। ফুলোন বেলুনের মত তারা ফেঁসে যায়।

বহু স্তরের এই সমুদ্রের রহস্য ভেদ করা সহজ নয়। সবে মাত্র এ কাজ আরম্ভ হয়েছে। সমুদ্রের ওপর-তলাগুলিতে যারা থাকে তাদের কথা আমরা অনেকদিন থেকেই জেনে আসছি। সমুদ্রের গভীর-তলা সম্বন্ধে কোন ধারণাই মানুষের ছিল না। গভীর সমুদ্রের কথা জানার অসুবিধা অনেক। যত নিচে নেমে যাওয়া যায়, সমুদ্রে জলের চাপ তত বেশি। খুব ভালো ডুবুরি আজকালকার আধুনিক যন্ত্র-পোষাক প'রেও বেশি দূর নামতে পারে না। তা ছাড়া সমুদ্রের নিচে খানিক দূর গেলেই অন্ধকার। দুই শত ফিটের পর সূর্য্যের আলো আর পৌঁছয় না। তারপরে যে অন্ধকার রাজ্য আরম্ভ হ'য়েছে, সেখানকার রহস্য জানতে মানুষকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

কিন্তু সে পবিশ্রম সার্থক। সমুদ্রের অতলের এই অন্ধকার রাজ্য মানুষের কল্পনাকে হার মানিয়ে দিয়েছে। এই অন্ধকার রাজ্যে কত অদ্ভুত ধরণের প্রাণী যে নিজের নিজের স্তরে বাস করে তার এখনও হিসেব হয়নি। তাদের কয়েকটিকে মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এই পাতালপুরীর প্রাণীগুলি সম্বন্ধে সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল তাদের নিজস্ব আলো। সূর্য্যের কিরণ যেখানে পৌঁছয় না, সেখানে প্রকৃতি নিজে থেকেই আলোর ব্যবস্থা করেছে। অন্ধকার সাগর-তলের সমস্ত প্রাণীই স্বয়ম্প্রভ। জোনাকির মত তাদের প্রত্যেকের গা থেকেই আশ্চর্য্য এক

'উজ্জ্বলা' ও 'শ্যামলা'

ওপরে মাছটির গায়ের খোসার রং সবুজ। নিচেরটির নাম স্কুইড্।
অসংখ্য উজ্জ্বল বিন্দুতে এরা আলোকিত

শীতল আলো বেরোয়। সেই আলোর সাহায্যেই তারা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার সঙ্গে শিকার ধরার কাজ চালায়। এ আলোক যেমন মনোহর তেমনি উজ্জ্বল। একদল ফরাসী বৈজ্ঞানিক গভীর সমুদ্র থেকে প্রবাল জাতীয় একরূপ স্বয়ম্প্রভ জীব তুলে এনে তাঁদের জাহাজের ল্যাবরেটরিতে রেখেছিলেন। আলোর উজ্জ্বলতা পরীক্ষা করবার জন্যে ল্যাবরেটরির অন্য সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেবার পর দেখা যায়, সেই প্রাণীগুলির আলোকে সাধারণ বইএর ছোট লেখা বারো তের হাত দূর থেকেও অনায়াসে পড়া যায়।

সমুদ্রের এই অন্ধকার-রাজ্যের অধিবাসীদের চোখগুলিও অদ্ভুত। অন্ধকারে বহুযুগ বাস ক'রে তাদের চোখের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অনেকের চোখ সেখানে একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে, কারোর কারোর

সাগরতলে অন্ধকারের অন্ধজীব

. প্রথম দু'টির একবারেই কোন চোখ নেই ; সবনিচেরটির দু' পাশে দু'টি দাড়া, তা'রই দু'ধারে দু'টি চোখ

চোখের বালাই আর নেই। মাথার দু'ধারে চাবুকের মত দু'টি লম্বা ছিপের সাহায্যে তারা চোখের কাজ সারে।

এই অন্ধকার-রাজ্যে তারা জীবনধারণ করে পরস্পরকে আহার ক'রে। সেখানে ছোট বড় কোন প্রভেদ নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেককে শিকার ক'রে ফিরছে। যে ভোগ্য, সেই ভোক্তা। নিজের আকারের

দু'গুণ তিনগুণ বড় প্রাণীকে উদরস্থ করতে এরা দ্বিধা করে না। এদের উদরের গঠনই এমনি যে তাকে অনায়াসে অনেকখানি প্রসারিত করা যায়।

পরস্পরকে আহার করা ছাড়া তাদের খাদ্যসংগ্রহের আর একটি উপায় আছে। ওপরের স্তর থেকে মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ অনবরত নিচে পড়ছে। সেই শব-বৃষ্টি নিচে পর্য্যন্ত বড় একটা পৌঁছতে পারে না। মাঝ-পথে নানা স্তরের অধিবাসীরা অনেকেই সেগুলির সদ্ব্যবহার ক'রে ফেলে।

কিন্তু এই থেকে প্রশ্ন হ'তে পারে, সমুদ্রে মূল আহার কি? সেখানে বড় প্রাণীরা ছোটকে এবং সকলে পরস্পরকে আহার করে সত্য, কিন্তু তাতে খাদ্য-রহস্যের সমাধান হয় না। পৃথিবীতে আমরা জানি, উদ্ভিদই সমস্ত প্রাণেব ভিত্তি। কীটপতঙ্গ থেকে ছোট ও বড় নিবামিষাশী প্রাণী উদ্ভিদের ওপর জীবন ধারণ করে। মাংসাশী ও আমাদের মত সর্ব্বভুক প্রাণীরও শেষ আশ্রয় সেই উদ্ভিদ। কিন্তু সমুদ্রে মূল খাদ্য কি?

এ প্রশ্নেব উত্তব অত্যন্ত বিস্ময়কর। সমুদ্রে পৃথিবীব মত কোন উদ্ভিদ নেই। উদ্ভিদ ব'লে যাদের মনে হয় সেগুলি সবই নানা জাতীয় প্রাণী। অগভীর সমুদ্রের নিচে নেমে গেলে দেখা যায় বিচিত্র এক অরণ্য—স্বপ্নের মত অপরূপ সব ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে। কিন্তু মজাব কথা এই যে, সেগুলি ফুল নয়, শিকার ধরবার রঙীন ফাঁদ মাত্র। সেগুলি গাছও নয়, একরকমের প্রাণী। গাছের মত তারা মৃত্তিকার রস শোষণ করে; বাতাস ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে তাকে দেহের কাজে লাগায় না। তারা অন্য জীবিত প্রাণীই আহার ক'রে বেঁচে থাকে।

পৃথিবীর মত কোন উদ্ভিদ না থাকলেও উদ্ভিদজাতীয় জিনিষ সমুদ্রে অবশ্য আছে এবং তারাই সামুদ্রিক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু চোখে তাদের দেখা যায় না। মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে অঞ্জলি ভ'রে যদি তার নীল জল তুলে

নিয়ে দেখা যায়, তাহ'লে তাকে নিতান্ত স্বচ্ছ ব'লে মনে হবে। কিন্তু সেই স্বচ্ছ জলে কোটী কোটী প্রাণ-কণিকা আছে। সেইগুলিই সমুদ্রের উদ্ভিদজাতীয় খাদ্য-মূল। উদ্ভিদের মত তারা মাটিতে শিকড় চালাবার সুযোগ পায় না, কিন্তু সমুদ্রের জলের জড় উপকরণকে সূক্ষ্ম শিকড়ে সংগ্রহ ক'রে বাতাস ও সূর্য্যের আলোর সাহায্যে তারা জৈব পদার্থে পরিণত করে উদ্ভিদেরই মত। সমুদ্রে সূর্য্যের আলো বেশিদূর পৌঁছয় না ব'লেই, ভেসে থাকবার প্রয়োজনে, এই সমস্ত উদ্ভিদজাতীয় জিনিষকে আণুবীক্ষণিক হ'য়ে ভেসে থাকার সমস্যা পূরণ করতে হয়েছে। এই আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক প্রাণ-কণিকার বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল 'প্লাঙ্কটন'। সমুদ্রের সমস্ত জীবজগৎকে এই প্লাঙ্কটনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এই প্লাঙ্কটনের রহস্য জানলে সমুদ্রের জীবনলীলার বৈচিত্র্যের অর্থও স্পষ্ট ক'রে বুঝা যায়। আণুবীক্ষণিক প্লাঙ্কটন আহার ক'রে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তারাও প্রায় আণুবীক্ষণিক নানা রকম জীব। তাদের মধ্যে চিংড়িজাতীয় অতিক্ষুদ্র একটি প্রাণীর প্রাধান্য আরও বেশি। সূর্য্যালোক যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছয় ততদূর পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রের জল এই সমস্ত আণুবীক্ষণিক প্রাণীতে পরিপূর্ণ। তুষার-শীতল মেরু-প্রদেশ থেকে সমুদ্রের অতল অন্ধকারে যত বিচিত্র জীবের সন্ধানই পাওয়া যাক না কেন, তাদের সকলের জীবন-টীকা অদৃশ্যপ্রায় এই প্লাঙ্কটনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর বিলুপ্ত আদিম অধিবাসী—
'ট্র্যাকোডন্' ও 'অ্যাল্লোসরাস্'

এরা মানুষেরও আগে পৃথিবীতে বাস করত

চার

নির্ব্বংশ জীব-গোষ্ঠী

বিলুপ্তির দুর্ভেদ্য রহস্য

কলিকাতা সহরের কোন পুরাতন বাসিন্দা যদি রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর মত ৩৯ বা ৪০ বছর বাদে আজ আবার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহ'লে কি রকম অবাক যে সে হবে, তা বোঝা শক্ত নয়। কলকাতার সে চেহারা আর নেই, শুধু তাই নয়, যান-বাহনও গেছে একেবারে বদলে। কোথায় গেল সে ঘোড়ায়-টানা ট্রাম আর ছ্যাকড়া গাড়ি! তার জায়গায় বিদ্যুতের ট্রাম চলেছে মাথায় আঁকশী তুলে, মোটর আর বাস চলেছে রাস্তা দিয়ে হুস হুস ক'রে। তখন যেখানে পৌঁছতে দু'ঘণ্টা লেগে যেতো, এখন সেখানে পোনেরো মিনিটে অনায়াসে চ'লে যাওয়া যায়। মোটরের আর বৈদ্যুতিক ট্রামের কাছে হার মেনে ঘোড়ার গাড়ি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে।

শুধু মানুষের সহরে নয়, প্রাণিজগতেও এমনি পুরোনো অনেক শ্রেণীর জীব যেন ক্লান্ত হ'য়েই এক এক সময়ে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে স'রে গেছে। তাদের চেয়ে চালাক আর চটপটে প্রাণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তারা অনেক সময়ে হটে গেছে সত্য, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাদের বিলোপের এত সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর যখন বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, তখনকার বিরাটকায় ডাইনোসর নামে সরীসৃপের কথা আজ এখানে তুলব না। লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীতে

রাজত্ব ক'রে আমাদের আজকালকার হাতীদের তিন চার গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও কেমন ক'রে তারা লোপ পেয়ে গেল, তার আশ্চর্য্য কাহিনী আর একদিন বলব। আজ শুধু সেই সব প্রাণীর কথা আলোচনা করব,

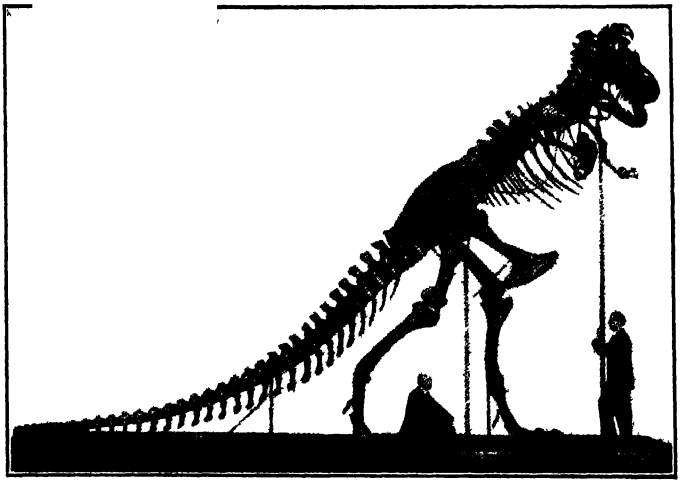

কঙ্কাল—মাংসভুক্ বিরাটকায় 'ডাইনোসর', ৪০ ফুট লম্বা
এ কেবল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে চলত

মাত্র গত হাজার বছরের মধ্যে যারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে বা এখন পেতে বসেছে।

আমাদের ভারতবর্ষে সেকালের কাব্যে, গল্পে, সিংহের কথার ছড়াছড়ি। পশুর মধ্যে সিংহ হ'ল রাজা। সবচেয়ে প্রধান কোন লোককে, সব চেয়ে জোরালো কিছুকে বোঝাতে হলেই সিংহের উপমা দেওয়া হ'ত।

আমাদের এই বাংলা দেশেরই সেকালের এক রাজার নাম ছিল সিংহবাহু, যাঁর ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন। বাঘের চেয়ে সিংহ এদেশে বেশি না হোক, কম ছিল না ব'লেই সেকালের সিংহের কথা

যত শোনা যায়, বাঘের কথা তত নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আজকাল সেই ভারতবর্ষে সিংহ নেই বললেই হয়। চিড়িয়াখানায় যে সব সিংহ ধ'রে রাখা হয়েছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাদের সবগুলিই এসেছে আফ্রিকা থেকে। এদেশের সিংহকে অনেক কষ্টে গোয়ালিয়রের কাছে রাজার খাস জঙ্গলে কয়েকটা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শিকার করা মানা। কিন্তু এত যত্ন-পাহারা সত্ত্বেও তারা কতদিন আর টিকবে বলা শক্ত।

ভারতবর্ষের প্রধান হিংস্র জানোয়ার এখন হ'ল বাঘ। বাঘ ও সিংহ, হিংস্র প্রাণী হিসেবে দুই-ই মানুষের শত্রু। মানুষ জঙ্গল কেটে বসতি করবার সঙ্গে এই দুই হিংস্র প্রাণীকেই উচ্ছেদ করবার চেষ্টা ক'রে আসছে। কিন্তু বাঘ এখনও টিকে থাকা সত্ত্বেও সিংহ যে কেন একেবারে হটে গেল, সে রহস্যের ঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীতে যে সমস্ত জানোয়ার সম্প্রতি লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তার জন্যে মানুষই অবশ্য প্রধানত দায়ী। মানুষের হাতেই বা মানুষের প্রভাবের দরুণই অনেক প্রাণী নির্ব্বংশ হয়েছে।

উত্তর-মেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে এককালে নানা জাতের তিমি প্রচুর দেখা যেতো। সমুদ্রের এই অতিকায় প্রাণীটিকে দেখলেই ভয় পাবার কথা। মোচার খোলার মত আগেকার জাহাজ বড় বড় তিমির একটা লেজের ঝাপটেই ডুবেই যেতে পারত। তবু মানুষতো কিছুতে ভয় পাবার নয়! এই বিশাল তিমি শিকার করতেও সে পেছপা হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত নরওয়ে আর সুইডেনের লোকের তিমি-শিকার একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। তিমি একটা মারতে পারলে লাভতো কম নয়। একটা তিমিমাছের গায়ে যে প্রচুর চর্ব্বি থাকে তা বিক্রী ক'রেই বড়লোক হওয়া যায়। তখনকার পালতোলা জাহাজের দিনে হার্পুন নামে হাতে-ছোঁড়া একরকম

বল্লম দিয়ে তিমি শিকার করা হ'ত। হার্পূনটার গোড়ায় দড়ি বাঁধা থাকত। হার্পূন তিমির গায়ে বিঁধে যাওয়া মাত্র তিমি যখন সমুদ্রে ছুট দিত বা ডুব দিত অগাধ জলে, তখন হুইলের সূতোর মত সেই দড়ি ছেড়ে দেওয়া হ'ত। তারপর আমরা যেমন ক'রে মাছ খেলিয়ে তুলি, তেমনি ক'রে সমুদ্রে হার্পূনে-গাঁথা তিমি তারা খেলিয়ে হয়রাণ ক'রে মেরে ফেলত। হাতে-ছোঁড়া হার্পূন দিয়ে তিমি শিকারের বিপদ সেদিন কম ছিল না। তিমি একবার ঘুরে নৌকো উল্টে দিলেই হ'ল!

যতদিন হাতে তিমি শিকার করতে হয়েছে ততদিন কিন্তু তিমির বংশ-লোপের সম্ভাবনা দেখা যায়নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যখন বাষ্পের জাহাজের কামান থেকে হার্পূন ছোঁড়ার ব্যবস্থা হ'ল, তখন তিমি শিকার সহজ ও নিরাপদ হওয়াতেই তিমিদের সর্ব্বনাশ হ'ল সুরু। লোভের বশীভূত হয়ে অসংখ্য জাহাজ নির্ব্বিচারে তিমি শিকার করতে সুরু করলে। শেষকালে এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, উত্তর দিকের সমুদ্রে তিমি আর দেখা যায় না বললেই হয়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জানোয়ার, যে অতিকায় নীল তিমি একদিন উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র তোলপাড় ক'রে ফিরত, আজ তাদের একটিরও দেখা পাওয়া দুর্লভ। তিমি-শিকারী জাহাজ চেষ্টা করলেও উত্তর-সমুদ্রে আর মারবার কিছু খুঁজে পাবে না। এখন এই সব তিমি-শিকারী জাহাজ দক্ষিণ-মেরুর দিকে তিমির খোঁজে ফেরে; অবাধে সেখানেও তাদের তিমি হত্যা করতে দিলে পৃথিবীতে কিছুদিন বাদে আর তিমি থাকবে কিনা সন্দেহ।

তিমির মত, উত্তর-আমেরিকার 'বাইসন' নামে মহিষ জাতীয় প্রাণীর বিলোপের জন্য শ্বেতাঙ্গরাই একমাত্র দায়ী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের বিশাল প্রান্তরগুলি এককালে এই বাইসনের বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল। এক এক পালে লক্ষ লক্ষ বাইসন তখন এই বিশাল দেশের

এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চ'রে বেড়িয়েছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের অনেক জাতির এই বাইসনই একমাত্র শিকার ও জীবিকার উপায় ছিল। তারা তল্পি-তল্পা তাঁবু নিয়ে এদের পিছনে পিছনেই দেশময় ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আহারের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি তারা কখনও হত্যা করত না। বহু প্রাচীনকাল থেকে শিকার ক'রে এলেও, বাইসন তাদের হাতে তাই লোপ পায়নি। ১৮৭১ সালেও আরাকানসাসের একজন পর্য্যটক পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাবার সময় বাইসনের একটি বিরাট পালের সাক্ষাৎ পান। পঁচিশ মাইল ধ'রে শুধু বাইসন ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পাননি। তিনি লিখেছেন—"মাটি আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু কালো মহিষ। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়, কালো জলের একটা দেশ-জোড়া বন্যা যেন দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বয়ে চলেছে।" এ রকম বড় পাল সে সময় আরো অনেকে দেখেছে। একটি পালে খুব কম ক'রে হিসেব ক'রেও অন্তত চল্লিশ লক্ষ বাইসন আছে ব'লে সেদিন জানা গিয়েছিল।

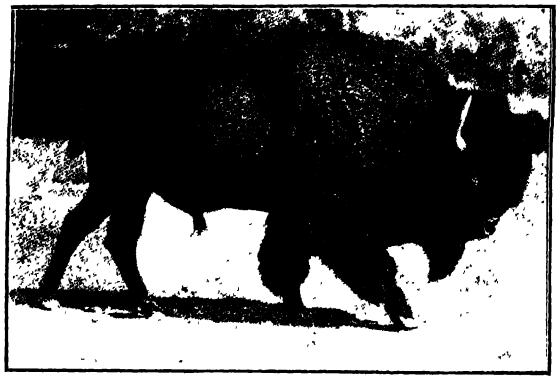

আমেরিকার লুপ্ত-প্রায় 'বাইসন্'

কিন্তু ১৮৭১ সালে একটি পালেই যেখানে চল্লিশ লক্ষ প্রাণী দেখা যেতো, ১৮৯৭ সালে সেখানে একটি বন্য বাইসনও আর দেখা গেল না। ভোজবাজীতে সমগ্র আমেরিকা থেকে বাইসন যেন উবে গেল। আমেরিকার

বাইসনের বিলোপ যে কত তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেখানকার একটি রেল কোম্পানীর চামড়ার চালানের হিসাব দেখলেই বুঝা যাবে। ১৮৮২ সালে যে রেল কোম্পানী দিয়ে ২ লক্ষ চামড়া চালান দেওয়া হয়, ১৮৮৩ সালে হয় ৪০ হাজার, ১৮৮৪ সালে হয় মাত্র ৩০০ ; আর ১৮৮৫ সালে একটিও চামড়া চালান যায়নি। এত অল্প সময়ে এমন আশ্চর্য্যভাবে আমেরিকা বাইসন-শূন্য হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ অবশ্য ইউরোপের লোকের চামড়ার লোভ। সেদিন আমেরিকায় যে যেখানে পেরেছে যতখুশী অবাধে বাইসন হত্যা করেছে এই চামড়ার লোভে। অতিরিক্ত ডিমের লোভে, যে হাঁস ডিম দেয় তাকেও যে মেরে ফেলা হচ্ছে এ হুঁস কারুর সেদিন হয়নি। হুঁস হল যেদিন আমেরিকার সীমাহীন প্রান্তরে বাইসনের রাশীকৃত সাদা হাড় ছাড়া অতীতের অগণন বাইসনযূথের অস্তিত্বের সাক্ষী আর কিছু রইল না। চামড়ার ব্যবসা শেষ হবার পর, জমির সার হিসেবে এই হাড়ের ব্যবসা ক'রেও সেখানকার লোক অনেকদিন চালিয়েছে। যাদের অস্ত্রে প্রাণ দিয়েছিল, বাইসনযূথ মৃত্যুর পর অস্থি দিয়ে তাদেরই জমি তারা উর্ব্বরা ক'রে দিয়ে গেল।

আমেরিকার কোন কোন পশু-সংরক্ষণী উদ্যানে এখন কয়েকটি মাত্র পোষা বাইসন দেখা যায়; তাদের স্বাধীন জ্ঞাতি খুঁজতে হ'লে, এখন যেতে হবে কানাডার ম্যাকেঞ্জি নদীর অঞ্চলে। সেখানে বাইসনের সগোত্র একরকম মহিষ এখনও বন্য অবস্থায় বিচরণ করে।

তিমি ও বাইসনের বেলায় মানুষকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে দোষী বলা চলে, ডোডো পাখির বেলা তেমন চলে না। ডোডো মরিশাস দ্বীপের একরকম বড় পাখি, দেখতে খানিকটা পাতিহাঁসের মত হ'লেও, তারা পায়রারই দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। চেহারা যেমন কদাকার, তেমনি তারা বুদ্ধিহীন ও সব বিষয়ে আনাড়ি। না পারে তারা আকাশে উড়তে,

না চটপট ডাঙায় দৌড়োতে। মরিশাস দ্বীপে সভ্য মানুষেব পদার্পণের ফলেই ডোডো. পাখি লোপ পায়, কিন্তু মানুষ নিজ হাতে তাদের ঠিক উচ্ছেদ করেছে বলা চলে না, মানুষেব আমদানী-করা ইঁদুর, শূয়াব ও বানবই. মবিশাস দ্বীপ থেকে এই নিরীহ নির্ব্বোধ প্রাণীটিকে বিলুপ্ত ক'রে দেয়। যে সমস্ত ইউরোপীয় নাবিক প্রথম মরিশাস দ্বীপে নামে, তারা ডোডো পাখিকে দয়া করেছিল ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। পাখিটিব মাংস খাবাব উপযুক্ত নয়, অন্য কোন জিনিষও তার দেহ থেকে পাওয়া যেতো না, তবু প্রথমে পর্ত্তুগীজ ও পবে ওলন্দাজ নাবিকেরা অহেতুক হিংসাবশে মাথায় মুগুব মেবে সে দ্বীপের অসংখ্য ডোডো পাখি সংহাব কবে। নির্ব্বোধেব মত পাখিগুলি লগুড়ের ঘায়ে নিহত হ'ত ব'লেই তাদেব নাম ওলন্দাজেবা দেয় ডোডো। ডোডো মানে ওলন্দাজ ভাষায় বেকুফ। পর্ত্তুগীজেবা মবিশাস দ্বীপ আবিষ্কাব করে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে; ১৬৮১ সালে সেখানে একটি ডোডো পাখিও আর দেখা যায়নি। দু'শ বছবও যাবা মানুষেব সভ্যতাব আওতায় টিকতে পাবল না, তাদেব তো বোকা বলাই সঙ্গত!

ডোডো পাখিব অনেক পরে আর একটি পাখি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে তাদেব বিলুপ্তিতে ইউবোপীয়দের কোন হাত নেই। এ পাখির নাম 'মোয়া'—তাদেব বাস ছিল নিউজীল্যাণ্ডে। মোয়া আফ্রিকার উটপাখিরই সগোত্র, তবে আকারে অনেক বড়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বারো ফুট লম্বা অর্থাৎ লম্বা লম্বা দুটি মানুষেব সমান 'মোয়া' বিরল ছিল না। নিউজীল্যাণ্ডের মাওরী জাতি শ' পাঁচেক বছর আগে তাদের প্রধান বাসস্থান থেকে উত্তরের একটি দ্বীপে পৌঁছে 'মোয়া' প্রথম আবিষ্কার করে। তার মাংস সুস্বাদু ব'লে এবং নিউজীল্যাণ্ডে বড় প্রাণী আর কিছু না

থাকাতে, 'মোয়া' মাওরীদের প্রধান শিকার হয়ে ওঠে এবং একশ বছরের মধ্যেই উত্তরের দ্বীপ থেকে একেবারে লোপ পায়। উত্তরের দ্বীপে আগে লোপ পেলেও নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত 'মোয়া' যে টিকে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবু কোন ইউরোপীয়ের জীবন্ত 'মোয়া' পাখি চাক্ষুস দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। দক্ষিণের দ্বীপে 'মোয়া' পাখীর লোপ পাওয়াও ভারী বিস্ময়কর ব্যাপার। মাওরীরা সেখানে গিয়ে সমস্ত 'মোয়া' মেরে যে ফেলেনি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত দুর্ভেদ্য দুর্গম জায়গায় প্রচুর পরিমাণে 'মোয়া'র কঙ্কাল পাওয়া গেছে, মাওরীরা সেখানে কোনকালে ঢুকতে পারেনি। তা সত্ত্বেও 'মোয়া' পাখি যে অকস্মাৎ কেমন ক'রে সবংশে সেখানে লোপাট হয়ে গেল, সে রহস্যের কোন যথার্থ মীমাংসা বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত করতে পারেননি।

বিশালকায় 'মোয়া' পাখি

শুধু মোয়া নয়, পৃথিবীর অনেক প্রাণীই কেন যে লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তার কোন সদুত্তর এখনো বৈজ্ঞানিকেরা দিতে পারেন না। আফ্রিকার গহন জঙ্গলের জিরাফের জ্ঞাতি 'ওকাপি', ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশের আধা-ভেড়া আধা-মহিষ 'টাকিন', ব্রেজিলের দীর্ঘপাদ লাল নেকড়ে, মঙ্গোলিয়ার বন্য ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু, সমশ্রেণীর 'বর্দ্ধিষ্ণু' প্রাণীদের চেয়ে বুদ্ধিতে বা বলে এমন কিছু খাটো ব'লে প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবু কেন যে তারা কালের বিবর্ত্তনের মিছিল থেকে পথের পাশে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে, তার রহস্য এখনও গভীর অন্ধকারে আবৃত। কিন্তু অত বড় 'ম্যামথ্' প্রাণীই যদি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, তবে আর অপর কোন প্রাণীর অন্তর্দ্ধানে আমাদের বিস্ময়ের কিছুই থাকতে পারে না।

রাজা-পেঙ্গুইন

পেঙ্গুইনদের মধ্যে পেঙ্গুইন-রাজই আকারে বড়

পাঁচ

মেরুতে ও মরুতে

পৃথিবীতে এমন জায়গা বলতে গেলে নেই-ই, যেটা একেবারেই প্রাণিশূন্য। যত নির্জন যত দুর্গম যত ভয়ঙ্কর স্থানই হোক না, কোন না কোন প্রাণী কোন বিশেষ উপায়ে সেখানকার অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে টিকে আছেই। ওঠ না তুমি হিমালয়ে কুড়ি হাজার ফুট পর্যান্ত, দু' একটা নেকড়ে কি ভালুক, হরিণ কি গাই, পাখি কি পোকা তোমার চোখে পড়বেই। আর নাম যদি সমুদ্রে আধ মাইল পর্যান্ত, সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখবে কত অদ্ভুত মাছ ইলেকট্রিক আলোর মত জ্বলছে। যত অসংখ্য রকমের প্রাণী আছে, সে তুলনায় পৃথিবীটা যেন বড়ই ছোট। জীবজগতের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে জায়গার জন্যে মারামারি। জলে কি জঙ্গলে, মাটির তলায় কি গাছের ওপরে যে যেখানে পেরেছে নিজের জায়গা নিয়েছে কায়েমি ক'রে।

মরুভূমির চেয়েও শূন্য যদি কোন জায়গা পৃথিবীতে থাকে সে হচ্ছে মেরুপ্রদেশ। বিশাল বালুরাশি আর বিশাল তুষারের প্রসার চিরকাল খাঁ খাঁ করছে, সাধারণ কল্পনায় এমনি মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এমন জীবও আছে যারা ঐ বালুর আর বরফেরই বাসিন্দা। অবশ্য গুণতিতে তারা কম হ'বেই। কৃপণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে আর কত রকম জানোয়ার বাঁচতে পারে? এমনিতে চোখে দেখতে মেরু আর মরু দুই-ই মনে হ'বে ধূ-ধূ শূন্যতা; কিন্তু তারই মধ্যে যে সব প্রাণী নানা কৌশলে টিকে আছে তাদের কথা শোন।

মরুভূমিতে জীবনের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে জলের আর গাছ-পালার অভাব। মরুভূমিতে গাছপালা খুব কম, কিন্তু একেবারেই যে নেই তা নয়। বেঁটে বেঁটে গাছ নানারকমের দেখা যায়, পাতা তাদের ছোট ছোট, কি পাতা থাকেও না। ফণিমনসা তোমরা অনেকেই দেখেছ সমুদ্রের ধারের বালিতে, মরুভূমির গাছপালার রকমটা হচ্ছে ঐ। তাতে ছায়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মরুজীবীর পক্ষে তা অন্নজল। ঐ বেঁটে বেঁটে শিরা-তোলা গাছগুলোর শিকড় চ'লে গেছে অনেক, অনেক দূরে, মাটির বহু নিচে—সেখানে ডালপালা-মেলা শিকড়ের এক জঙ্গল। এই সব

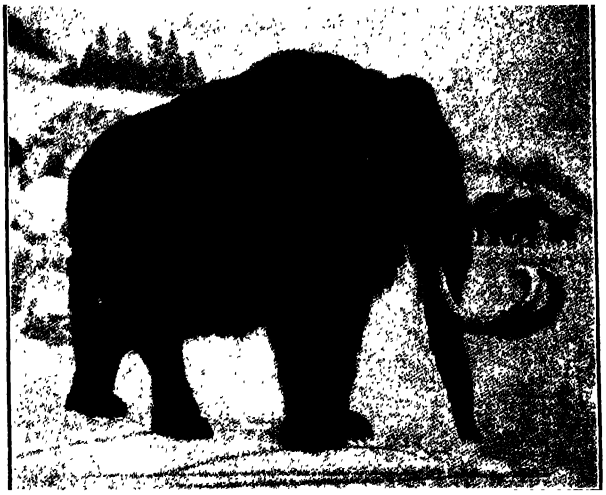

ম্যামথ

গাছের বাড় হয় মাটির তলাতেই, উপরের অংশ নিতান্তই ছোট। আর ঐ লম্বা শিকড়গুলো চারদিকে বহুদূর ছড়িয়ে তারা মাটির তলাকার জল শুষে আনে, তাই তাদের কাঁটা কাঁটা শরীরে বারো মাস জল জমা থাকে। ফণিমনসা দেখে তোমার আমার জিভে জল আসে না অবশ্য, কিন্তু সে বহু মরুপ্রাণীকে একসঙ্গে অন্নজল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে।

তা ছাড়া, মরুভূমিতে যে একেবারেই বৃষ্টি হয় না যত অল্প ও অনিয়মিতই হোক, যেটুকু বৃষ্টি হয় তারই ফলে

মত কিছু কিছু গাছও গজিয়ে ওঠে। তারা বেশিদিন বাঁচে না; বৃষ্টি থামলেই ম'রে যায়, বৃষ্টি পেলেই আবার বেঁচে ওঠে। এই দু'রকমের গাছই মরুচরদের খাদ্য। তাদের কারো কারো আলাদা জলখাবার দরকারই হয় না; যেমন গেজেল-হরিণ (Gazelle) আর নানারকমের পোকা।

কিন্তু প্রায়ই মরুভূমিতে বৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলের ধারা বয়; আর যদি মরুভূমিকে ঘিরে পাহাড়ের সারি থাকে,

উটের বহর

এরাই মরুভূমির উপযুক্ত বটে

তা'হলে সেই পাহাড় থেকে জলের ধারা নেমে কিছুদূর পর্যান্ত যেতে
র ধারার আয়ু কয়েক দিন কি কয়েক ঘণ্টা, আর
বেশিদূর যাবার আগেই মিলিয়ে যায়; তবু ঐটুকু
প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে যাদের রীতিমত জল

সব সময় জল পাওয়া যায় না ব'লে এই সব প্রাণী নিজেদের শরীরের মধ্যেই জল মজুত রাখবার অদ্ভুত ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে।

এদের মধ্যে উটের কথা তোমরা সকলেই শুনেছ। কিন্তু তা ছাড়া আরো আছে। মস্ত মস্ত কচ্ছপ আর টিকটিকির শরীরের মধ্যে যে জল পাওয়া যায় তা মানুষ দিব্যি খেতে পারে, এবং সেইজন্য অনেক অসভ্য মানুষ তাদের শিকার করতেও ছাড়ে না। সাহারা মরুভূমির মধ্যে এমন এক জায়গায় একটা কচ্ছপ পাওয়া গিয়েছিলো যার ষাট মাইলের মধ্যে কোন জল ছিল না। অমন জায়গায় যে কোন প্রাণী থাকতে পারে তা ভাবাও যায় না, কিন্তু কচ্ছপটি দিব্যি সুখেই ছিল।

ব্যাঙ একটি জীব যা স্যাঁতস্যাঁতে জলো জায়গা ছাড়া বাঁচতেই পারে না; কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে এক জাতের ব্যাঙ মরুভূমিতে বাসা বেঁধে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এদের শরীরের চামড়ার মধ্যে এত বেশি জল জমা থাকে যে, রুক্ষ উত্তপ্ত ধূ-ধূ বালুর তলায় এদের ছোট্ট গর্ত্তের দেয়াল থাকে স্যাঁতস্যাঁতে। যত গরম যত শুকনোই হোক না, এই ব্যাঙের জলের অভাব হয় না কখনও।

এ ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে মরুচররা জলাভাবের সমস্যা সমাধান করে। বড় বড় স্তন্যপায়ী জানোয়ার—যেমন সিংহ শেয়াল হায়না—দিনের বেলায় বিশ্রাম করে, রাত্রে শিকারের সন্ধানে বেরোয়। বালু যত তাড়াতাড়ি গরম হয়, ঠাণ্ডাও হয় তত তাড়াতাড়ি; সেজন্য মরুভূমিতে রাত্রিগুলো বেশ ঠাণ্ডা, রাত্রে রীতিমত শিশির পড়ে। সুতরাং যারা জাত-নিশাচর তাদের কোনরকম কষ্টই হয় না। মরুভূমিতে অনেক পোকামাকড়েরও বাঁচবার এই উপায়।

মরুভূমির প্রকাণ্ড টিকটিকিরা অন্য উপায় বাৎলেছে। তাদের শরীরে এমন পুরু, শক্ত কাঁটা কাঁটা চামড়া গজিয়েছে যে, রোদ যতই তীব্র

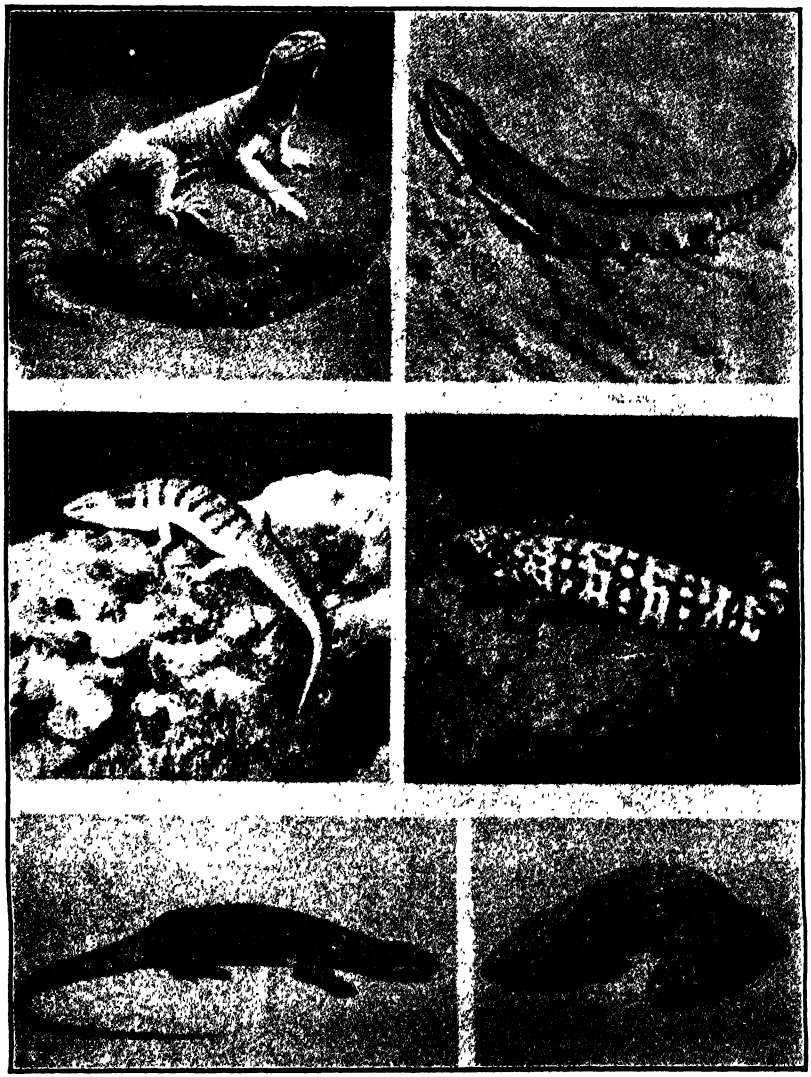

উত্তাপ ও শুষ্কতায় যারা ভয় পায় না

। কয়েকটি এমন অদ্ভুত প্রাণী আছে, যারা মরুভূমিতেও স্বচ্ছন্দে বাস করে। এদের পিঠের চামড়াও তাপ সইবার উপযোগী

হোক তাদের গায়ে কিছু লাগেই না। যেমন কিনা ফণিমনসার গাছ অত রোদেও বাঁচতে পারে শক্ত খোলস আছে ব'লে। প্রকৃতিই এদের পরিয়ে দিয়েছে অক্ষয় বর্ম্ম। আবার অস্ট্রেলিয়ার এক জাতের টিকটিকির চামড়া ব্লটিং কাগজের মত জল শুষে নিতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ও এক হিসেবে সবচেয়ে ভালো আত্মরক্ষার উপায় বা'র করেছে শামুক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা। এরা করে কী? অসহ্য শুক্‌নো গরমের সময়টা এক রকম ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দেয়; সে ঘুম এমন যে মৃত্যুর মতই মনে হয়। এমনি ক'রে মাসের পর মাস তারা কাটাতে পারে। তারপর যেই বৃষ্টি পড়ে, অস্থায়ী গাছপালা দেখা দেয়, অমনি তারা খোলসের মধ্যে নড়ে-চড়ে রীতিমত বেঁচে ওঠে। এমন কখন কখনও হয়েছে যে বৈজ্ঞানিকেরা যাকে শুধু খোলস মনে ক'রে তাঁদের যাদুঘরে নিয়ে সাজিয়েছেন, সে হঠাৎ একটা জ্যান্ত শামুক হ'য়ে উঠে চম্‌কে দিয়েছে। বছরের পর বছর তারা অমনি কাটাতে পারে; প্রাণে মরে না, সুযোগ পেলেই বেঁচে ওঠে।

এ সব জীবজন্তু যে কষ্টে আছে তা মনে করবার কিন্তু কোন কারণই নেই। বরঞ্চ মরুভূমির বাইরে নিয়ে এলেই এদের বিলক্ষণ অসুবিধে হবে। মরুজীবনের পক্ষে এদের উপযোগিতা সমস্ত হিসেবেই। মরুভূমিতে কোন উজ্জ্বল রঙের জীব নেই। সকলেই হলদে কি হল্‌দে-ধূসর, ঠিক বালুর মতই রঙ, যাতে ঐ বালুর প্রসারের মধ্যে মিশে গিয়ে শত্রুর চোখ এড়াতে পারে। উট কি দক্ষিণ আমেরিকার লামা মরু-অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সব চেয়ে দরকারী জন্তু। তারা দুধ দেয়, তাদের পিঠে চ'ড়ে মালপত্র নিয়ে মানুষ মরুভূমি পার হ'য়ে যায়। উটের পায়ের গড়নই এমন যে, শুকনো সমতল বালুর ওপর তারা খুব দ্রুত চলতে পারে, স্বাভাবিক জায়গার ভিজে অসমান

মাটিতে এলে তাদের হোঁচট খেয়ে পা ভাঙবারই সম্ভাবনা। আফ্রিকার উটপাখি ওড়ে না, বালির ওপর দিয়ে চমৎকার দৌড় দেয়। জোরোবা চলে লাফিয়ে লাফিয়ে। টিকটিকি বালুর তলা দিয়ে এমন ছোটে যে দেখে মনে হয় সাঁৎরে যাচ্ছে। মরুভূমির বাইরে এলে এরা হয়ে পড়বে নিতান্ত অচল ও অসহায়।

বরফ আর সমুদ্র—সমুদ্র আর বরফ, এই হচ্ছে দুই মেরুপ্রদেশ, পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ সীমান্ত। প্রদেশ বললুম, কিন্তু আসলে ও-দুটো মহাদেশ। ইংরেজিতে উত্তর মেরু-মহাদেশকে বলে Arctic আর দক্ষিণকে বলে Antarctic. দুটোর মধ্যে প্রভেদ এই যে দক্ষিণমেরু হচ্ছে এক বিশাল স্থলপ্রসার, অস্ট্রেলিয়ার প্রায় আড়াইগুণ বড়, চারদিকে তার জল; আর উত্তরমেরু হচ্ছে বিশাল জলরাশি, চারদিকে তার স্থল। দক্ষিণমেরু বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ গোছের ব'লে সেখানে কোন চতুষ্পদ জন্তু নেই। আর গ্রীষ্ম[illegible]ও সেখানে অতি নিদারুণ শীত ব'লে একটু-আধটু ব্যাঙের ছাতা, শ্যাওলা ইত্যাদি ছাড়া কোনরকম গাছপালাই জন্মাতে পারে না।

কিন্তু উত্তরমেরুর প্রকৃতি মোটেও অত ভয়ঙ্কর নয়। প্রথম কথা, সেখানে মানুষ আছে ও থাকতে পারে। এস্কিমোরা সেখানকারই বাসিন্দা। তার কোন-কোন জায়গায় বছরে কয়েক মাস বরফ গ'লে যায়, তখন সেখানে ঘাস গজায়, এমন কি রঙ-বেরঙের ফুলও ফোটে। শীত সেখানেও খুব, কিন্তু মাটির স্বাভাবিক উর্ব্বরতাকে সে-শীত ঠেকাতে পারে না। জীব-জন্তুর বৈচিত্র্য ও সংখ্যাও সেখানে দক্ষিণমেরুর চেয়ে অনেক বেশি।

দক্ষিণমেরুতে পাখির মধ্যে স্কুয়া জল-শকুন (Skua gull) আর বিখ্যাত পেঙ্গুইন, আর স্তন্যপায়ীর মধ্যে সীল—এ ক'টাই

উল্লেখযোগ্য। পেঙ্গুইনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সীল আর তিমি, নামে মাছ হ'লেও আসলে স্তন্যপায়ী; পেঙ্গুইনও নামে মাত্রই

পেঙ্গুইন

পাখি। অবশ্য জাতে এরা পাখি; বাচ্চা এদের ডিম ফুটেই বেরোয়, আর এদের কাঁধের দু'দিকে পাখাও আছে, কিন্তু সে-পাখার ব্যবহার এরা একেবারেই ভুলে গেছে। মানুষের মত দু'পায়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু ক'রে পেঙ্গুইন থপ্‌থপ্‌ ক'রে হাঁটেন, ঠিক যেন এক গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক সাজগোজ ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এদের গায়ের রঙ কালো, আর বুকের দিকটা সাদা; হঠাৎ মনে হয় যেন ড্রেস-স্যুট-পরা সায়েবের হাস্যকর নকল করেছে।

অন্যান্য বিষয়ে এদের বরঞ্চ সামুদ্রিক মাছের মত বলতে হবে। এরা যদিও ডাঙার জীব, এদের জলচর বললেও দোষের হয় না। সেই দূর দক্ষিণের ঠাণ্ডা সমুদ্রে অনায়াসেই এরা ঘুরে বেড়ায়, এদের রসদও আসে সমুদ্র থেকে। এদের প্রধান খাদ্য সমুদ্রের কুচো চিংড়ি।

এদের জিভ এমনভাবে তৈরি যে, এক ঢোঁক জল মুখে নিয়ে জলটা এরা বা'র ক'রে দিতে পারে, কিন্তু চিংড়িগুলো থাকবে জিভে আটকে।

পেঙ্গুইনদের ঠিক বন্য বলা চলে না। এদের হাব-ভাব চাল-চলন এমন, ঠিক যেন মা-বাপ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। ডাঙায় ছোট ছোট পাথর দিয়ে বাসা তৈরি ক'রে এরা থাকে। বাপ বেরোন মা আর ছেলেপুলের খাবার জোগাড় করতে। তার উপায়টা ভারি মজার। বাপ করেন কী, সমুদ্রে নেমে আকণ্ঠ এমন খাওয়া খান যে, পেটটি মস্ত বড় হ'য়ে ফুলে ওঠে। তারপর ভোজের পরে টলতে-টলতে কোনোরকমে বাড়ি ফিরে তিনি তাঁর পেটের ভিতরকার খাদ্য উগরে-উগরে উপরে তোলেন, আর ছেলেপুলেদের নিয়ে মা তাঁর নিচের ঠোঁট থেকে ঠুকরে-ঠুকরে সেই সব খান।

মানুষের মধ্যে বিয়ে হয়; পেঙ্গুইনের মধ্যে ঠিক সে-রকম না-হ'লেও যেটা হয় আর-কোন প্রাণীতেই সে-রকমের কিছু দেখা যায় না। বছরের একটা সময়ে শ্রীযুক্ত পেঙ্গুইন ঠোঁটে ক'রে একটা পাথর নিয়ে শ্রীমতী পেঙ্গুইনের পায়ের তলায় রাখেন। শ্রীমতীর যদি কোনো আপত্তি না থাকে তিনি সেটা ঠোঁটে তুলে নিজের কাছে টেনে আনেন। তার মানেই তাঁদের 'বিয়ে' হ'লো। একবার বেশ একটা মজা হয়েছিল। মেরু-অভিযানের এক সায়েব এক ডিসেম্বর মাসের দিনে (দক্ষিণমেরুতে তখন গ্রীষ্ম) একটা পাথরের উপর ব'সে কতগুলো নোট লিখছেন এমন সময় এক পেঙ্গুইন এসে তাঁর পাৎলুনের পায়ে বেজায় ঠোকরাতে লাগলো। তিনি তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। পরে সায়েব তাকিয়ে দেখলেন পেঙ্গুইন তাঁর পায়ের কাছে একটি পাথর এনে রেখেছে! বোধ হয় তাঁর পাৎলুনের পা'কে শ্রীমতী পেঙ্গুইন ব'লে ভুল করেছিল!

পেঙ্গুইন সত্যি অতি অদ্ভুত জীব। এরা পাখি হ'য়েও ওড়ে না, মাছ না-হ'য়েও জলে সাঁৎরায় ও জলের জিনিস খায়, মানুষ না-হ'য়েও দু'পায়ে হাঁটে। কিন্তু মেরুতে যাওয়া সম্ভব হবার পর থেকে মানুষ এদের লাখে-লাখে ঝাঁকে-ঝাঁকে মেরে এতদিনে প্রায় নির্বংশ ক'রে এনেছে। মারবার কারণ আর-কিছুই নয়, মেমসায়েবদের টুপির জন্যে এদের পালক জোগানো।

স্তন্যপায়ীর মধ্যে দক্ষিণমেরুতে সীল আর তিমি। তিমি গ্রীষ্মকালে ছাড়া থাকে না, সীল বারো মাসই থাকে। শীতে সীল ভয় পায় না। তাদের গায়ের চামড়ায় যে জামা তৈরি হয় তা প'রে মানুষও অতি দুর্দ্দান্ত শীতে কাবু হয় না। মনে করো মস্ত সমুদ্র, তাতে ভাসছে বরফের এক-একটি মস্ত পাহাড়; সেখানে দলে-দলে সীল খেলা করছে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-মেরুর সূর্য্যও মন্দ গরম হয় না, তখন তুষারখণ্ডে শুয়ে-শুয়ে ওরা রোদ পোহায়। চারদিকের চোখ-ঝলসানো সাদা বরফের মধ্যে ওদের কুচকুচে কালো শরীর অদ্ভুত দেখায়। ডাঙায় ওদের চাল-চলন কিছু কিম্ভূত গোছের। কিন্তু জলে ওরা দ্রুত সাঁতার কাটে, যদিও নিশ্বাস নিতে মাঝে-মাঝে উপরে উঠতে হয়। এরা মাছ ছাড়া কিছু খায় না,

'সীল'—একটা খাড়া জায়গা ধ'রে ওপরে উঠছে

এবং যে-পরিমাণ মাছ এরা খেতে পারে তার প্রায় সীমা নেই। এমনিতে এরা বেশ ফূর্ত্তিবাজ আমুদে, যত ইচ্ছে খেতে পেলে আর শুয়ে থাকতে পেলে এদের আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু এদের গায়ের মূল্যবান তেল আর চামড়ার জন্য মানুষ এদেরও মেরে-মেরে প্রায় শেষ ক'রে এনেছে। সীলের মাছ খাওয়ার যদি বা সীমা থাকে, মানুষের লোভের কোনো সীমাই নেই।

সীল উত্তর দক্ষিণ দুই মেরুতেই সমান আছে। উত্তরমেরুতে পেঙ্গুইন নেই, কিন্তু নানারকম স্তন্যপায়ী আছে। তার মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় মেরু-ভালুকের। সাধারণ ভালুকের চেয়েও এ অনেক বেশি হিংস্র, দেখতে তুষারেরই মত ধবধবে সাদা, গলাটা লম্বা, মাথাটা ছোট্ট। মানুষের বসতির ঢের দূরে এই দুরন্ত শ্বাপদ রাজার মত ঘুরে বেড়ায়। মানুষ যখন এর কাছে ঘেঁসে, সঙ্গে নিয়ে যায় একপাল এস্কিমো কুকুর। এই কুকুরও অতি ভয়ানক। মেরু-প্রদেশের নেকড়ের রক্তে এদের জন্ম, স্বভাবও প্রায় নেকড়েরই মত। মেরু-ভালুক শিকার

উত্তরমেরুর হিংস্র অধিবাসী—মেরু-ভালুক

করতে পেলে এরা আর কিছুই চায় না। সাধারণত দশটা কুকুর মিলে একটা ভালুককে সাবাড় করতে পারে।

কলকাতার জাদুঘরে একটি জলহস্তীর নমুনা আছে—ইংরেজিতে একে বলে walrus। প্রকাণ্ড কালো শরীর, হাতির মত মস্ত দুটো দাঁত—যদিও হাতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রকৃতি যেন তার সকল সন্তানকেই বাঁচাবার ফন্দি এঁটে রেখেছে। মেরু-ভালুক ঘোরে বরফের সাদা ডাঙায়, তার রঙও সাদা—বরফের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে না। আর জলহস্তীর বাসা উত্তরের মেরু-সমুদ্রের ঠাণ্ডা জল, সেখানে তার কালো রঙ সহজেই চোখ এড়িয়ে যায়। এদের খাদ্যের ব্যবস্থাও সমুদ্রে। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর মধ্যে জলহস্তীই সব-চেয়ে বড় জানোয়ার—অবশ্য তিমিকে বাদ দিয়ে। এরা লম্বায় প্রায় বারো ফুট, ওজনে চল্লিশ মণের কাছাকাছি যায়। দুর্দান্ত মেরু-ভালুকেরও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এরা।

এ ছাড়া উত্তর মেরুতে নেকড়ে আছে, শেয়াল আছে; একরকম ষাঁড় আছে, দেখতে অনেকটা ভেড়ার মত, তাদের গায়ের মাংসে মৃগনাভির গন্ধ ব'লে তাদের বলে মৃগনাভি-ষাঁড় (Musk-ox)। পাখি-পোকার কথা ছেড়েই দিলুম। মোটের উপর দক্ষিণমেরুর চাইতে উত্তরমেরু জীব-জন্তুর বসবাসের অনেক বেশি উপযুক্ত ব'লেই মনে হয়।

রক্তশোষা রাক্ষুসে বাদুড়

দিনের বেলা এইভাবে প'ড়ে থাকে ; রাত্রিতে শিকার খুঁজতে বেরোয় ;
দাঁতগুলো ক্ষুরের মত ধারালো, ঘুমন্ত প্রাণী অনেক সময়
এর আক্রমণ জানতেও পারে না।

ছয়

রাক্ষুসে বাদুড়

চামচিকে, বাদুড়—স্বভাবতই এরা কেমন যেন বিশ্রী। শুনলেই গা-টা ঘিন-ঘিন করে না? এদের সম্বন্ধে কত রকম অপবাদই তোমরা শুনে থাকবে। বাদুড় ঘরে ঢুকলে অলক্ষণ, চামচিকে গায়ে পড়লে

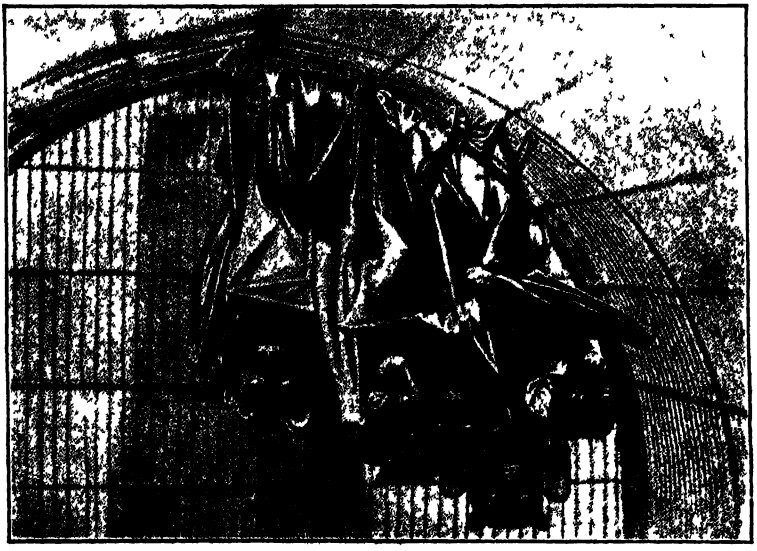

বাদুড়

এরা এইভাবে নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে বিশ্রাম করে ও ঘুমোয়

চামচিকের মতই শুকিয়ে যায়, এমনি কত। আসলে কিন্তু এরা অতিশয় নিরীহ, পেট ভ'রে ফল খায়, আর পা দিয়ে গাছের ডাল আকড়ে

মুণ্ডুটা শূন্যে ঝুলিয়ে পরম আরামে ঘুমোয়। তবু মানুষ এদের কোনো-দিনই ভালো চোখে দেখতে পারেনি; তার কারণ এদের কুৎসিত—কখনো-কখনো অতি বীভৎস চেহারা, আর এদের কতগুলো অদ্ভুত অভ্যেস। মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে জীব-জগতে বাদুড় ছাড়া আর কেউ বোধ হয় ঘুমোয় না। তারপর এরা নিশাচর; সমস্তটা দিন ঝুলে-ঝুলে ঘুমোবে, আর রাত্রে বেরোবে বিরাট দল বেঁধে পঙ্গপালের মত শিকারের খোঁজে। বাদুড় আলো সইতে পারে না, এটা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জানো। বাদুড় সর্বদাই প্রকাণ্ড দল বেঁধে থাকে বটে, কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও কম করে না, অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে ভাব করা তো দূরের কথা। ওদের যে কোনো-কোনো দেশে উড়ো শেয়াল বলে, চেহারার মিল ছাড়াও তার একটা কারণ বোধ হয় এই। অবিশ্যি শেয়াল দল বেঁধে থাকে না; সে একা-একাও থাকে, আবার অন্য কারো সঙ্গেও মেশে না। বাঘ সিংহ সাপ থেকে আরম্ভ ক'রে ভোঁদড় পর্যান্ত মানুষ পুষেছে; কিন্তু এই শেয়াল আর বাদুড় কখনই মানুষের কাছে ঘেঁসেনি। তা ছাড়া বাদুড়ের গোড়াকার কথাটাই অদ্ভুত! দেখতে শুনতে সকল বিষয়েই পাখির মত হ'লেও এরা পাখি নয়, স্তন্যপায়ী।

কতগুলো কথা ভাবলে কিন্তু বাদুড়কে তারিফ করতে হয়। জীবন-সমস্যার মীমাংসা অতি সহজেই করেছে এরা। পৃথিবীর সব জীব-জন্তুরই একটা বাসার দরকার, এক বাদুড়েরই সে-দরকার নেই। আঁকড়ে ধরবার একটা ডাল পেলেই এদের চ'লে যায়। পাখি না হয়েও অনেক পাখিরই চেয়ে এরা দ্রুত উড়তে পারে; ছোট্ট শরীরের তুলনায় এদের পাখার প্রসার খুবই বড়। তার উপর এদের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, যা দিয়ে অন্ধকারেও এরা টের পায় অন্যদিক থেকে কেউ

আসছে কিনা। এটা ওদের একটা 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়' গোছের; তার সাহায্যে অন্ধকারে আকাশে এরা উড়ে চলে কিন্তু কারো সঙ্গে কখনো ঠোক্কর খায় না। জীবজগতে প্রাণরক্ষার জন্য যে মারামারি কামড়াকামড়ি হিংস্র সংগ্রাম চারদিকেই চোখে পড়ে, এই বাদুড়ের বেলায় সেটা যেন খাটেই না। এরা যেন জন্ম থেকেই নিশ্চিন্ত। মস্ত এক-একটা গাছে হাজার-হাজার বাদুড়ের এক-চেটে উপনিবেশ; সমস্ত দিন তারা ঘুমোয়, রাত্রি হ'লে অন্ধকারে উড়ে-উড়ে রাজ্যের ফল খেয়ে পেট ভরায়। বাদুড়-ঝোলা গাছ তোমাদের চোখে দু'একটা পড়েছে নিশ্চয়ই—কলকাতাতেও তার অভাব নেই, যদিও সহরে এরা ততটা সুবিধে পায় না। অস্ট্রেলিয়ায় বাদুড় খুব বেশি। সেখানকার কুইন্সল্যাণ্ডে পঁচিশ 'একার' জায়গা জুড়ে একটা বাদুড়ের ক্যাম্প দেখা গেছে। ভাবতে পারো অতখানি জায়গায় কত বড় বড় গাছ থাকতে পারে? আর সব গাছ মিলিয়ে কত লক্ষ বাদুড়কেই জায়গা দেয়? সন্ধ্যা হ'লে এরা যখন সব একসঙ্গে আকাশে ওড়ে, তখন লাখো লাখো পাখায় আকাশ কালো হ'য়ে যায়।

রক্তশোষা বাদুড়ের বীভৎস রূপ!
আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে
এ'দের দেখা যায়

বাদুড় সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার শুধু আমাদের দেশে নয়, ইয়োরোপেও

বহুকাল ধ'রেই প্রচলিত। প্রাচীনকাল থেকেই সেখানকার লোকের ধারণা, যে একরকম বাদুড় আছে যাঁরা মানুষের রক্ত শুষে খায়—তাদের বলা হ'তো Vampire—রক্ত-শোষা। এই ভ্যাম্পায়ার অবলম্বন ক'রে অনেক রূপকথা কাহিনী গল্পেরও সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু এ রকম বাদুড়ের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ অনেকদিন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ব্যাপারটা শুনতে রূপকথারই মত, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই রক্ত-শোষা বাদুড় সত্যি-সত্যি আছে। অবশ্য ঠিক জাতটা বা'র করতে মানুষের অনেক সময় লেগেছে, তার আগে কেবলই যত দোষ চাপানো হয়েছে নিরীহ জাতের ঘাড়ে। আসল ভ্যাম্পায়ারকে ধরেন ডারুইন স্বয়ং। সে-সময়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধানে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর চাকর একটা রাক্ষুসে বাদুড়কে হাতে-হাতে ধ'রে ফেলে; সে তখন একটা ঘোড়াকে শুষে খাচ্ছিল।

রক্তশোষা বাদুড়—থ্যাব্ড়ানাকী

এই রাক্ষুসে বাদুড় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েস্ট্ ইণ্ডিস্ দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কোথাও নেই। সবচেয়ে বড় জাতের বাদুড়কে বলে কালং, পাখা ছড়ালে তারা পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত হয়। বড় ব'লে মানুষের সন্দেহ প্রথমে এদের উপরেই পড়ে। কিন্তু আসল রাক্ষুসে দেখতে খুব ছোট, আকারে মোটে তিন ইঞ্চি, কিন্তু পাখার প্রসার

ন' থেকে বারো ইঞ্চি পর্য্যন্ত। লাল্‌চে-ব্রাউন রঙ; অন্যান্য বাদুড়ের তুলনায় এদের প্রায় চারপেয়ে বলা যায়, কেননা পায়ে ভর দিয়ে এরা মাটি থেকে দু' ইঞ্চি পর্য্যন্ত উঠতে পারে, আর ছুটতে পারে ঠিক যেন বড়ো একটা পোকা। আগেকার দিনে লোকের ধারণা ছিলো যে এরা এদের শিকারের চারদিকে উড়ে বেড়ায়, আর তাদের পাখার হাওয়ার জন্যেই ঘুম ভাঙে না। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল; কেননা এরা দৌড়ে গিয়ে শিকার কাম্‌ড়ে ধরে, উড়ে গিয়ে বসে না।

বিশেষত্বের মধ্যে এদের লেজ নামমাত্র, আর নাকের উপর পাৎলা একটা চামড়া আছে। তা ছাড়া অবশ্য এদের দাঁতগুলি লক্ষ্য করবার। মাংসাশী জন্তুর মত, সাধারণ বাদুড়েরও সামনের দাঁতগুলো ছোট ছোট, আর তার পাশের তেকোণা চোখা দাঁতগুলো (যেগুলোকে কুকুর-দাঁত বলে) বড়-বড়। কিন্তু রাক্ষুসের কুকুর-দাঁত যত বড় আর ধারালো, সামনের দাঁত-গুলোও তাই; আর কোনো শক্ত জিনিস খেতে হয় না ব'লে মাড়ির দাঁত নিতান্তই ছোট ও তুচ্ছ। পাশাপাশি চারটে দাঁত সমান বড় আর ধারালো ব'লে ওরা এমন কামড় বসাতে পারে যে, একটুও লাগে না। চামড়ার উপর অতি ছোট্ট ফুটো ক'রে মনের সুখে ওরা রক্ত শুষে নেয়, যাকে খাচ্ছে তার ঘুম পর্য্যন্ত ভাঙে না। মানুষকে কামড়াতে হ'লে সাধারণত ওরা ঘুমন্ত লোককেই আক্রমণ করে; লেপের তলা দিয়ে পায়ের আঙুল বেরিয়ে থাকে ব'লে সেটাই ওদের প্রিয় জায়গা—যদিও, সেটা না জুটলে, নাকের ডগাতেও আপত্তি নেই। রাক্ষুসের খাওয়া জোটে কি না জোটে তার তো কিছু ঠিকঠিকানা নেই; সেইজন্যে তাদের পেটের মধ্যে একটা লম্বাটে থলি থাকে, যাতে তারা একবারেই অনেক দিনের মত খেয়ে নিতে পারে। সুতরাং যে-পরিমাণ রক্ত তারা খেতে পারে সেটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়। সাধারণত এরা একেবারে ছোট ওষুধের গেলাসের এক

গেলাস রক্ত খায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিড়িয়াখানায় ঐরকম দু'গেলাস রক্ত এদের প্রতিদিনের খাদ্য কি পানীয়। মুরগি-টুরগি তো তখন-তখনই ম'রে যায়, গোরু-ঘোড়াও রীতিমত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। মানুষের পক্ষে মারাত্মক না-হ'লেও বাদুড়-দেব বার-বার দয়া করলে কী হয় কে জানে?

সেদিন পর্য্যন্তও বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে এই রাক্ষুসে বাদুড় কামড়ায় যেমন, তেমনি ঘা সারিয়েও দিয়ে যায়—অন্তত দিতে পারে, যদি মানুষ বাধা না দেয়। প্রায়ই দেখা যায় যে এই বাদুড়ে কামড়ানো লোকের, বাদুড় চ'লে যাওয়ার পরেও, রক্ত পড়ছে। সেটা পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন বলেছেন যে বাদুড়কে শেষ পর্য্যন্ত শুষতে দিলে এটা হ'তো না। প্রায়ই এমন হয় যে, লোকে ঘুমের মধ্যেই হাত নেড়ে রাক্ষসটাকে দেয় তাড়িয়ে। সেইজন্যই রক্ত পড়তে থাকে। তা না করলে বাদুড় পেট ভ'রে খাওয়ার পর ঘায়ের মুখে নিজের খানিকটা থুতু লেপে দিয়ে যায়; তাতে রক্তপড়া সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হ'য়ে যায়, আর কোনোরকম ছোঁয়াচেরও ভয় থাকে না। কিন্তু আজকাল আর এ-কথা কেউ মানেন না। বাদুড়ের থুতু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা এখন বরঞ্চ একরকম সন্দেহ করেন যে তাতে এমন কোনো জিনিষ আছে যার জন্য রক্ত জ'মে যেতে পারে না—আর সেই কারণেই বাদুড় কামড়িয়ে পালিয়ে যাবার অনেক পরেও রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। তা ছাড়া এরা একরকম রোগের বীজাণু গোরু থেকে ঘোড়ায় সংক্রামিত করে; গোরুর তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে তা মারাত্মক। মোটের উপর বাদুড়ের থুতুতে কোনোরকম আরোগ্যের উপাদান নেই এটা নিশ্চিত। বরঞ্চ ক্ষতিকর কিছু থাকাই সম্ভব।

এই হচ্ছে আসল রাক্ষুসে, যদিও অনেকে ভুল ক'রে ফল-খেকো কি পোকা-খেকো বাদুড়কে রাক্ষুসে বলেছে। তবে আমাদের ভারতবর্ষে

এরকম বাদুড় আছে, তাদের নকল রাক্ষুসে বলা যেতে পারে, যদিও তাদের জাত একেবারেই আলাদা। এরা ক্যানিবল গোছের; বাচ্চা বাদুড় পেলে তারই রক্ত খায়—পাখি কি টিকটিকি হ'লেও আপত্তি নেই। অবশ্য এরা ঠিক রক্ত শোষে না, বরঞ্চ কুড়্‌মুড়্‌ কোরে হাড় চিবিয়ে খায়—হায়েনার মত সমস্ত ধড়টাকে একসঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। আমাদের দেশেই আর-একরকমের বাদুড় আছে, তারা খেজুরের রস খেতে বড় ভালবাসে। খেজুরগাছের সঙ্গে যে-সব হাঁড়ি বাঁধা থাকে তারা রাত্রে এসে সেগুলো শেষ ক'রে যায়, তারপর নাকি মাতাল হ'য়ে ঐখানেই গড়াগড়ি!

মানুষ এ পর্য্যন্ত অনেক জীবকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে এসেছে; কিন্তু এটা আশ্চর্য্য যে বাদুড়ের সে কিছু করতে পারেনি, যদিও এ তার বিশেষ কোনো কাজে লাগে না। বাদুড়ের সংখ্যা পৃথিবীতে যেন বেড়েই চলেছে। অথচ বছরে ওদের একবারই বাচ্চা হয়, আর একসঙ্গে দুটোর বেশিও হয় না। কোনো কোনো বাদুড় পোকা-মাকড় খেয়ে মানুষের কিছু উপকার করে বটে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি অপকার করে ফল-খেকো বাদুড়। জানো তো, ফলের চাষ অস্‌ট্রেলিয়ার একটা প্রধান ব্যবসা, আর সেখানে এই বাদুড়ের উৎপাত এক সময়ে এত বেশি বেড়েছিলো যে তাদের মারবার জন্য নানারকম ভীষণ যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়েছিলো। তবু দ্যাখো, পৃথিবীতে বাদুড়ের অভাব নেই। বর্মায় নাকি ছোট একজাতের বাদুড় আছে, তারা যখন একসঙ্গে বেরোয়, দূর থেকে মস্ত মেঘের মত দেখায়; আর বর্মা ছাড়িয়ে আরো পূবে নাকি এক ঝাঁক বাদুড় বেরোয়, সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ লক্ষের কম হ'বে না। সূর্য্যের মুখও দেখা যায় না!

বাদুড়ের এই প্রতিপত্তির কারণ আগেই বলেছি। জীবন এদের

অসাধারণ রকম সহজ। কারো সঙ্গে লড়াই ক'রে এদের টিঁকে থাকতে হয় না তো! নিজের জাত ছাড়া ওদের কোনো শত্রু নেই—এ-বিষয়ে ওরা মানুষের মত। ওদের মধ্যে যত খুন-জখম—সব নিজেদের মধ্যে

দক্ষিণ আমেরিকার রক্তশোষা বাদুড় গাছে ঝুলছে
রাত্রিতে এরা কখনো এমন চুপচাপ থাকে না—তখনই
রক্ত শুষবার মহাপার্ব্বণ আরম্ভ হয়

মারামারিতে। ভাগ্যিস্ ওটা হয়! নয় তো বাদুড়ের জ্বালায় পৃথিবীতে হয়তো টেঁকাই যেতো না! বনে-জঙ্গলে কি জলে, ভয়ানক শক্তিমানেরও কত শত্রু! প্রকাণ্ড তিমিকে হাঙররা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়। বাঘের সঙ্গে ময়াল সাপের লড়াই লাগলে কে জেতে ঠিক নেই। কিন্তু এই বাদুড় জাতটা আকারে নিতান্ত ছোট ও বেশির ভাগ নিরীহ হ'লেও যেন প্রকৃতির কতগুলো বিশেষ দয়ায় খুব সুখেই বেঁচে আছে। এদের জীবনে কোনো বন্ধন নেই, কোনো হাঙ্গামা নেই। বাসার ভাবনা নেই এদের, পা দুটো ঝোলাবার একটু জায়গা পেলেই হ'লো। প্রকাণ্ড পাখাই লেপ-কম্বলের কাজ করে, তা দিয়ে গা মুছে নিয়ে ঘুম। এদের বাচ্চারা মায়ের পাখার নিচেই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে, তাদের নিয়ে মায়েরা উড়ে চলে আকাশে-আকাশে। পাখাই বাদুড়ের সর্ব্বস্ব, পাখার জোরেই ওরা টিঁকে থাকে। ওরা উড়তেও পারে খুব, বাতাসে ভেসে থাকতেও পারে অনেকক্ষণ। পাখিদের পাখা প্রায়ই জখম হ'তে দেখা যায়, কিন্তু বাদুড়ের পাখা সর্ব্বদাই আস্ত ও সক্ষম। তার কারণ এই যে, পাখিদের পাখা ভাঙলে আবার সারে, তাতে নতুন পালক গজায়; কিন্তু বাদুড়ের পাখা একবার ভাঙলে আর রক্ষে নেই। না পারে সে ডাঙায় হাঁটতে, না পারে দাঁড়াতে। যে-জীব আকাশে উড়তো, পোকার মত বুকে ছ্যাঁচড়ানো ছাড়া তার উপায় থাকে না। যে-বাদুড়ের একবার কোনোরকমে পাখা ভেঙেছে, মৃত্যু ছাড়া তার গতি নেই।

পেচক—'মিটমিটে'

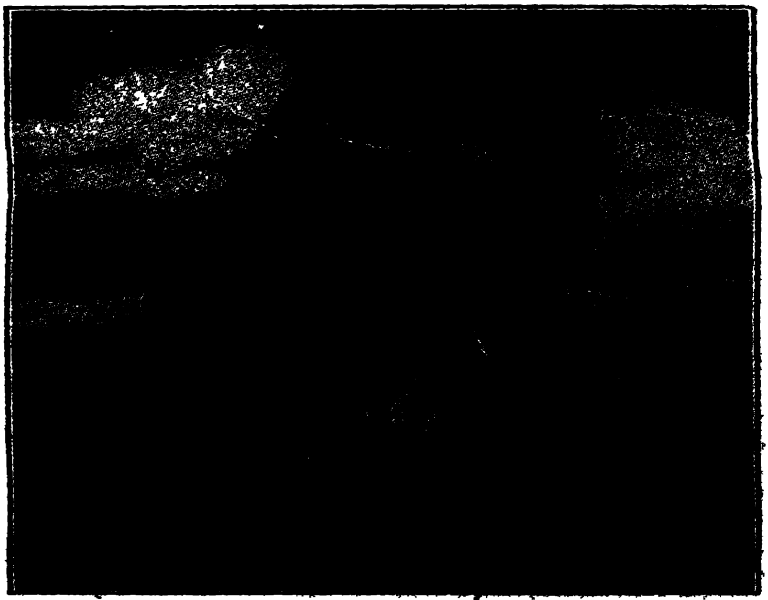

সাত

অন্ধকারের জীব

ইঁদুর, প্যাঁচা, বাদুড়, ছুঁচো—অন্ধকারের জীব বললে এদের কথাই আমাদের মনে পড়ে। দিনের আলো এরা ভালোবাসে না, এরা বেরোয় রাতের অন্ধকারে, চুপে-চুপে, শিকারের সন্ধানে। কিন্তু এদেরকেও ঠিক অন্ধকারের জীব বলা যায় না; দিনের আলোয় এরা যে কখনোই একেবারে না বেরোয় তা নয়। রাত এরা ভালোবাসে, ভালোবাসে অন্ধকার। ছুঁচোও কখনো-কখনো তার মাটির তলার সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসবে উপরে, পুকুরে জল খেতে।

এই পৃথিবীতে কত যে বিচিত্র ও অদ্ভুত উপায়ে জীবেরা বসবাস করে, তার অন্ত নেই; কিন্তু যে অন্ধকারের জীবদের কথা এখন বলবো তাদের মত অদ্ভুত সত্যি বুঝি আর কিছু নেই। সত্যি সত্যি এরা অন্ধকারের সন্তান। এদের বলা হয় 'গুহাবাসী'। মাটির অনেক, অনেক নিচে অতি গভীর গুহায় এদের বসবাস—যেখানে কখনো সূর্যের ক্ষীণতম আলোও পৌঁছয় না। সেই চিরন্তন রাত্রিতে এদের জন্ম, এদের জীবন, এদের মৃত্যু।

এ-রকম গুহা আছে ইয়োরোপে, আছে আমেরিকায়। অস্ট্রিয়ায় কেন্টাকির গুহাগুলো বিশেষ ক'রে বিখ্যাত। ওখানে, দেখা যায়, এই গুহা-বাসীরা নানা বিচিত্ররূপে তাদের অদ্ভুত অস্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে।

এদের পূর্ব্বপুরুষরা সাধারণ স্থলচরই ছিলো; কোনো দৈবক্রমে বহুকাল আগে তাদের কেউ কেউ ঢুকে পড়েছিলো ভূতলের গুহায়, তারপর সেই বিশাল, অন্ধকার গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরোবার আর পথ পায়নি। এই দুর্ভাগাদের মধ্যে যারা ম'রে যায়নি, তারা আস্তে-আস্তে নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেই নিজেদের নিয়েছিলো খাপ খাইয়ে। তাদেরই বংশধরেরা আজ পাতালের প্রাণী।

এরা বেশির ভাগ অবিশ্যি পোকা-মাকড় জাতীয় ছোট ছোট প্রাণী। আলোর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই ব'লে এরা প্রায়ই অন্ধ। সেই একই কারণে এদের গায়ের কোনো রঙ নেই—প্রায়ই সাদা কি খুব ফিকে কোনো রঙের। যে-জগতে এদের বাস, সেখানে বছরের পর বছর বিবর্ণ স্তব্ধতার রাজত্ব: সেখানে শীত-গ্রীষ্ম নেই, উত্তাপের বাড়তি-কমতি নেই, নেই দিনরাত্রি, শত্রু খুব কম, খাদ্যও খুব কম। এসব অবস্থার জন্যে এই জীবেরা এমনভাবে তৈরি হ'য়ে গেছে যে তাদের অতি কষ্টে জীব বলা যায়। দুর্ভিক্ষ তাদের কায়েমি ব'লে তাদের শরীরও ছোট হ'তে হ'তে প্রায় কঙ্কালে এসে ঠেকেছে—তাদেরই স্থলচর আত্মীয়দের সঙ্গে কোনো তুলনাই অবিশ্যি হয় না। এদিকে

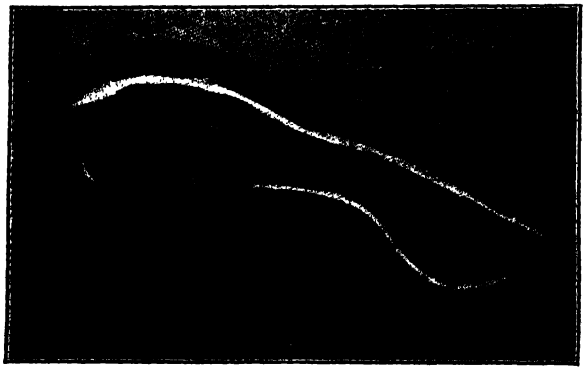

নিশ্চক্ষু সাপ

আফ্রিকার নিচোখো সাপ। গোল্ডকোষ্ট অঞ্চলে ভূমি-গহ্বরে দেখতে পাওয়া যায়

তাদের হাত-পা শুঁড় হ'য়ে গেছে অসাধারণ লম্বা ও সূক্ষ্ম; চোখে ছাখে না ব'লে এদের ঘ্রাণ ও স্পর্শশক্তি হয়েছে খুব তীক্ষ্ণ। কিন্তু চোখে না দেখলেও আলো সম্বন্ধে এরা অনেকেই সচেতন;' গুহার মধ্যে একটা টর্চ জ্বাললে এরা দলে দলে ছুটবে কোণে-ঘুপচিতে লুকোতে। এদের দেখে চট্ ক'রে বোঝাই যায় না যে এরা অন্ধ। গুহার মেঝেতে খাদ্যের খোঁজে এরা এমন তাড়াতাড়ি চট্‌পট্ ছুটোছুটি করে, ঠিক যেন অন্ধকারে দেখতে পায়।

অ্যাডলেপ ব'লে একরকম পোকার কথা ধরা যাক। এরা স্থলচর গুবরেপোকার আত্মীয়, দেখতে অতি ক্ষুদ্র। পাতালের চির-রাত্রিতে এদের ভবলীলা। অন্ধ হ'য়েই এরা জন্মায়, কিন্তু চোখ না থাকাতে এদের কোনো রকম অসুবিধে হয় ব'লে মনে হয় না। এরা খুব চট্‌পটে ছট্‌ফটে, কোথাও এতটুকু একটু সাড়া-শব্দ হ'লেই দে ছুট। আর এক জাত আছে পাতালের গঙ্গাফড়িং, গুহার স্যাঁৎসেতে দেয়ালে ঝুলে থেকেই এরা জীবন কাটায়—দৌড়ে পালায় বিপদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা হ'লে। এদের কারো কারো নামমাত্র চোখ আছে, কারো কারো একেবারেই নেই। লম্বা শুঁড়গুলো এদের খুব কাজে লাগে। এদেরই এক জাতভাইয়ের না আছে চোখ,

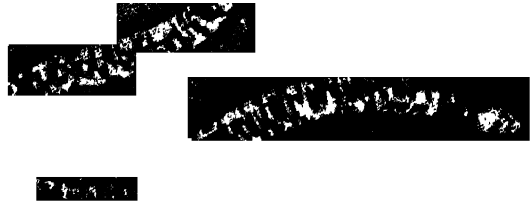

পাতালপুরীর গুপ্তচক্ষু টিক্‌টিকি
দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী—গায়ের চামড়ার নিচে এদের চোখ লুকোনো আছে

না আছে পাখা, শরীর কঙ্কালসাব, শুধু আছে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা পা আর সুতোর মত শুঁড়। অনেক জাতের মাকড়সাও পৃথিবী থেকে পাতালে আশ্রয় নিয়েছে—তাবাও ছোট্ট, দুর্ব্বল, বলতে গেলে অন্ধ। তবু তারা অনেকে জাল বোনবার পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি; যদিও সেই গুহার অন্ধকাব শূন্যতায় জালে আটকাবার মত খাদ্য প্রায় কিছুই নেই।

এই সব পোকা-মাকড় কী খেয়ে বাঁচে, তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। সেই পাতালে তো গাছপালা কিছু জন্মায় না। মাঝে-মাঝে জন্মায় ব্যাঙের ছাতা, তা-ই খায়, খায় পুরোনো পচা কাঠ। ফুর্ত্তি ক'বে যে সব মানুষ ও-সব অঞ্চলে চড়ুইভাতি করে, তাদের আহাবের গুঁড়িগুঁড়োতে অনেকেব প্রাণ বাঁচে। আগেকার দিনে মানুষ মোমবাতি হাতে ক'রে ও-সব গুহায় ঢুকতো, মোমের যে-সব ফোঁটা শক্ত হ'য়ে জমে থাকতো সেটা হ'তো এদের বিরাট ভোজ। এখন ইলেকট্রিক টর্চ হ'য়ে এদের সে-ভাতও মারা গেছে। আর মাংসাশী পোকারা খায় নিজেদেরই ও অন্য পোকাদের ডিম, নিজেদের মধ্যেও অল্প-বিস্তর খাওয়া-খাওয়ি চলে। মোটের উপর, খাদ্য এদের জোটে খুব কমই, সেইজন্যে শরীরও মোটে বাড়তে পারে না।

এই গুহাগুলো ঠিক কেমন তা বোধ হয় তোমরা এখনো বুঝতে পারছো না। উত্তর আমেরিকার কেন্টকিতে এক বিরাট গুহা আছে—নামই তার Mammoth Cave; এই গুহার আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গ মাইল—রসাতলের রাজধানী, বলতে পারো। তার মধ্যে আছে অনেক অন্ধকার হ্রদ, অনেক গভীর স্তব্ধ দীঘি—আর ঘরগুলো গর্ত্ত-গহ্বর ছাড়া কিছুই নয়। সেই সব গর্ত্ত-গহ্বরের আঁকাবাঁকা এলোমেলোর ভিতর দিয়ে ব'য়ে চলেছে অনেক নদী। এ-সব জলাশয়ে জীবের

সংখ্যা খুব বেশি হবে তা আশাই করা যায় না। আশ্চর্য্য এই যে, এসব জলাশয়েও জীব আছে। পৃথিবীর যত আজগুবি, যত অসম্ভব জায়গা—কোনোটাই বুঝি একেবারেই প্রাণবর্জ্জিত নয়। সেই সব পাতাল-নদীর তলায় সাদা অন্ধ সব পোকা নুড়ির গায়ে গায়ে আটকে আছে; কালো জলে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় প্রেতের মতো মাছ। এরা কী খায়? খায় বোধ হয় পরস্পরকে, আর খায় উপর থেকে ভেসে-আসা খাদ্য-জঞ্জাল। খুব কম খেয়েই এদের বাঁচতে হয়। এই জলের জীবেরা সকলেই সাদা, বিবর্ণ, প্রায়-স্বচ্ছ, ও অন্ধ। এদের একটা বিশেষত্ব এই যে

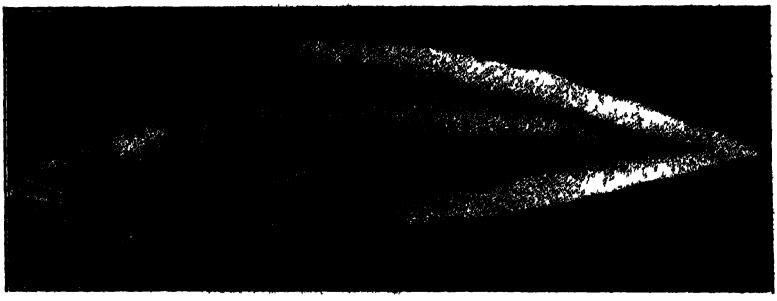

অন্ধ মাছ

আমেরিকার মিসিসিপি নদীর পূর্ব্ব অংশে দেখা যায়। সম্পূর্ণ সাদা। অনুভূতিসম্পন্ন কতগুলি খোসায় এর মাথা আবৃত—এতেই সে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এদের সঙ্গে নদীর মাছের চাইতে সমুদ্রের মাছেরই মিল বেশি। এই গুহাবাসী অন্ধ মাছেরা অত্যন্ত ভীরু, শুঁড়ই এদের একমাত্র সহায়। একোয়েরিয়মে (জলজন্তুর চিড়িয়াখানা) এদের সামনে খাদ্য দিয়ে দেখা গেছে, এরা সহজে কাছে আসে না, কাছে এসেও অনেকবার লাফ দিয়ে পিছনে স'রে যায়। অনেকক্ষণ পরে যখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে যে জিনিষটা শত্রু নয়, তখনই সাহস ক'রে খায়।

এই অদ্ভুত মাছও অনেক রকমের আছে ; কিন্তু পাতালের কালো জলে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে সব চেয়ে আজগুবি জীব হচ্ছে—নামটাও তার আজগুবি—ওল্‌ম্‌। এদের পাওয়া যায় শুধু আমেরিকার কার্নিওলা, কারিন্থিয়া ও ডাল-মাশিয়া—এই তিন রাজ্যে ; সেখানকার মাটির নিচেকার মস্ত থমথমে গুহা-গহ্বরের ভিতর দিয়ে যে-জল-স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেখানে এদের বাসা। সে-সব গুহা-গহ্বর এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত, বন্যার সময় এরা যখন উপরে ভেসে আসে, তখনই এদের দেখা যায়।

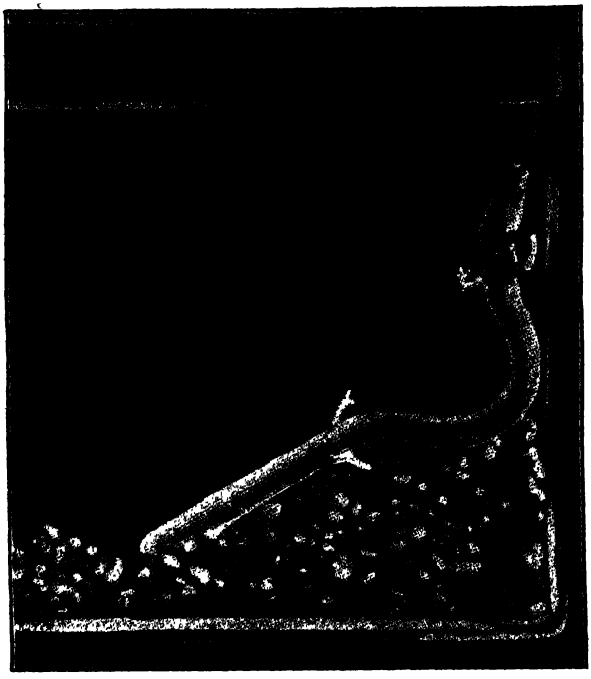

আজগুবি জীব—'ওল্‌ম্‌'

ওল্‌ম্‌-এর শরীরটা সাপের মত, প্রায় এক ফুট লম্বা। মাথাটা সরু ; ছোট-ছোট হাত-পা, চলবার মোটেই উপযোগী নয়। তাতে অবিশ্যি কোনো অসুবিধে হয় না, কারণ ইনি একটি কুড়ের বাদশা। এর সমস্ত জীবন বলতে গেলে কাটে জলের নিচেকার পাথরের উপর শুয়ে-শুয়ে। গলার দু'দিকে একটু লালের ছিটে ছাড়া এর সমস্ত শরীরটা একেবারে সাদা ; কিন্তু উপরে আলোয় তুলে আনলে এর রঙ আস্তে-আস্তে একে-

বারে কুচ্‌কুচে কালো হ'য়ে যাবে। এর চোখ নষ্ট হ'তে-হ'তে এখন মাথার পুরু চামড়ার নীচে মিশে গেছে; জলের আলোড়ন অনুভব ক'রে-ক'রে আর ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে এ শিকার ধরে।

কিন্তু শিকার ধরবার জন্যেও এ মোটে ব্যস্ত নয়। নিজের বাড়ি-ঘরে যখন থাকে, তখন জলে যে-কোনো পোকা-টোকা ভেসে এলো, তাই এ খায়, খাবার চেষ্টায় বেশি দূরেও যায় না। কেননা এই আশ্চর্য্য জীব অনাহারে বছরের পর বছর থাকতে পারে—একোয়েরিয়মে বন্দী অবস্থায় কোনো-কোনো ওল্‌ম্‌ বছরের পর বছর খায়নি। এটা অবিশ্যি এই অন্ধ, জলচরদেরই বিশেষত্ব! অন্ধ মাছেরাও, পুকুরে আটকে রাখলে, কিছুই খায় না—আর না খেয়ে বেশ ভালোই থাকে।

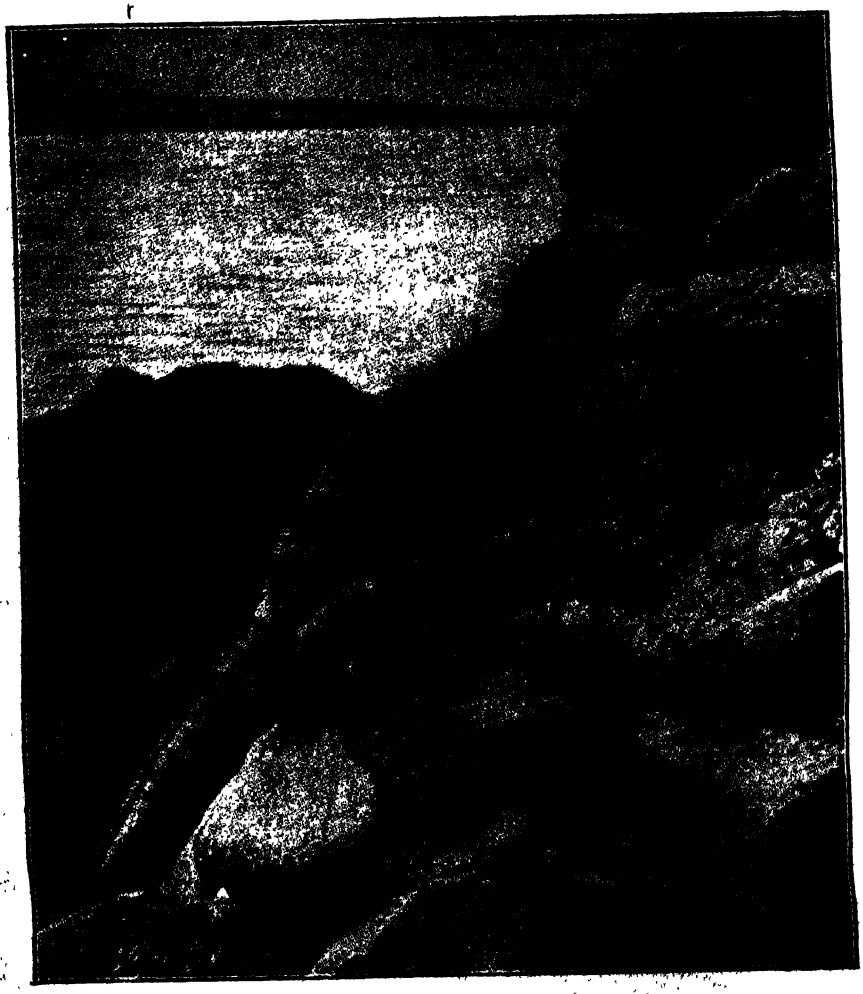

রাক্ষুসে গোলাপ

আট

সত্যিকারের ড্র্যাগন

চীনের ড্র্যাগনের কথা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছো। ড্র্যাগন চীনেদের পবিত্র সরীসৃপ। সকল অনুষ্ঠানে সকল কাজের আরম্ভে ড্র্যাগনকে স্মরণ না করলে চলে না। রাক্ষুসে বাদুড়ের মত একে জড়িয়েও কত গল্পের ছড়াছড়ি! এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, চীনের ড্র্যাগন আগেকাব দিনের ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মতই কাল্পনিক।

সত্যিকাবেব ড্র্যাগন

কোমোডো দ্বীপের বিশালকায় টিক্‌টিকি—কুমিরের চেয়েও বড়। ঘাড়, বুক ও সুমুখের পায়ের মাংসপেশী খুব মজবুত

তাই ব'লে ড্র্যাগন সত্যি-সত্যি নেই তা ভেবো না। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের অস্তিত্বও তো মানুষ আবিষ্কাব করেছে মাত্র গত শতাব্দীতে, কিন্তু মানুষের কল্পনায় সে স্থান পেয়েছে পুরাকাল থেকে। তেমনি চীনেরা

চিরকালই কোনো বৃহৎ আকারের সরীসৃপের কল্পনা করেছে; কিন্তু মানুষ তার খোঁজ পেয়েছে মাত্র সেদিন, তাও চীনদেশে নয়।

যারা বুকে হাঁটে তারাই হ'লো সরীসৃপ (Reptile): যেমন সাপ বিছে টিকটিকি কুমির ইত্যাদি। এর মধ্যে সাপের সঙ্গে টিকটিকির প্রভেদ তোমরা সকলেই লক্ষ্য ক'রেছো। টিক্‌টিকির পা দেখা যায়, তার লেজ আর ধড় আলাদা; সাপের পা দেখা যায় না, মাথার পর তার শরীরে আর কোনো ভাগ নেই। গোসাপকে আমরা সাপ বলি বটে, কিন্তু আসলে সে টিক-টিকিরই বড় সংস্করণ, তারও বড় হচ্ছে কুমির। এখন যাদের কথা বলবো তারা কুমিরের চেয়েও প্রকাণ্ড টিকটিকি। তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এরা এতই অদ্ভুত যে, এদের জন্যে 'ড্র্যাগন' নামটা আলাদা ক'রে রাখলে দোষের হয় না। ড্র্যাগনের কল্পনা ইয়োরোপে; সে-দেশে পুরোনো সাহিত্যে ও রূপকথায় চলতে-ফিরতে ড্র্যাগনের দেখা মেলে—অনেকটা আমাদের দেশের রাক্ষস-খোক্ষসের মত। এখন দেখা যাক্ সত্যিকারের ড্র্যাগন কী-রকম।

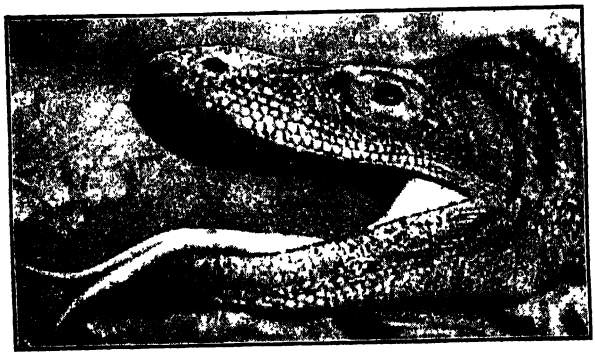

টিক্‌টিকি-বংশের ঐরাবত

কোমোডো দ্বীপের অধিবাসী। খুব কঠিন ধাতুর আবরণও এর কামড়ে বিদীর্ণ হ'য়ে যায়

আগেই বলেছি এ-জীবটি বিরাট অতিকায় টিকটিকি ছাড়া কিছু নয়। এদের মধ্যে নানা জাত আছে; সব চেয়ে বড় জাত পাওয়া

গেছে ডাচ্ ঈস্ট্ ইণ্ডিজ-এর কোমোডো নামে এক দ্বীপে; মানে, ভারতবর্ষের অনেকখানি পূবে ভারত-মহাসমুদ্রের এক ক্ষুদ্র অখ্যাত দ্বীপে।

পনেরো ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয় এরা, যদিও বেশির ভাগ ন'দশ ফুটে এসেই থামে। টিকটিকি জাতের মধ্যে এদের মত জাঁদরেল আর নেই। এদের পেশীগুলো চমৎকার, মাথা হাত-পা লেজ সবই বেশ বড় বড়, সাপের মত দ্বিখণ্ডিত লম্বা জিভ, জোরালো দাঁত, ঝকঝকে চোখ—আর সব চেয়ে বেশি যেটা চোখে লাগে তা হচ্ছে এদের চাল-চলনের পরমগম্ভীর ভঙ্গি। গায়ের চামড়া এদের মোটা মোটা, আঁশে ঢাকা, কিন্তু ভারি সূক্ষ্ম সব রঙ করা। প্রত্যেকটা আঁশে একটা ক'রে ব্রাউনরঙের দাগ আছে ব'লে মোটের উপর বাদামি মনে হয়; কিন্তু আসলে ওর চামড়াটা কম্‌লারঙের, মাথা আর হাত-পা কালো-কালো।

কোমোডো দ্বীপের ড্র্যাগন পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ এক ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে এই অদ্ভুত জানোয়ার কোত্থেকে এবং কী ক'রে এলো ভেবে অবাক লাগে। ইয়োরোপের লোকের সঙ্গে এদের ভালো ক'রে পরিচয় হয়েছে মাত্র সেদিন। এখন অবশ্য লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এক জোড়া কোমোডো ড্র্যাগন পরমসুখে বসবাস করছে। এর আগে আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় এনে এদের বাঁচানোই যায়নি; কিন্তু লণ্ডন জু-তে এদের জন্য এমন চমৎকার বাড়ি ক'রে দেওয়া হয়েছে যে, এখন আর এদের কোনো কষ্টই হয় না। কোমোডো দ্বীপে এরা থাকে রোদে-পোড়া পাথরে বিশাল শরীর মেলে সারাদিন শুয়ে, রাত্রে ঘুমোয় নিজেদের তৈরি গুহায়, খায় ইঁদুর মুরগি কি যে-কোনো পশু-পাখি হাতের কাছে পায়। লণ্ডন জু-তে কিছুরই অভাব হয় না যুগল ড্র্যাগনের। গুহা ক'রে দেওয়া হয়েছে, বৈদ্যুতিক শক্তিতে গরম-করা পাথর আছে, আছে সাঁতার কাটবার পুকুর, তালগাছ, নকল

সূর্য্যালোক—মোটের উপর, ঐ জায়গাটুকু একেবারে নিখুঁত কোমোড়ো দ্বীপ। এদের খেতে দেয়া হয় প্রধানত মুরগি আর ডিম, আর ডাক্তারের

ড্র্যাগন্-টিক্‌টিকির প্রাতরাশ

একটা গোটা মুরগি গিলে জলযোগ করছে

পরিচর্য্যা তো রোজই আছে। এতেও যদি ওরা ভালো না থাকে নিতান্তই নেমকহারাম বলতে হবে।

গায়ে এদের অসাধারণ জোর। একবার এদের একজন চামচে থেকে ডিম খেতে গিয়ে চামচে সুদ্ধ ভেঙে নিয়ে গিয়েছিলো—হাতলটা র'য়ে গিয়েছিলো রক্ষকের হাতে। এক কামড়ে একটা চামচে ভেঙে ফেলা বড় সহজ কথা নয়। বদ্‌মেজাজি হিংস্র ব'লে এদের একটা দুর্নাম ছিলো, কিন্তু এখন জু-তে যিনি এদের তত্ত্বাবধান করেন তিনি বলেন যে এরা এত ঠাণ্ডা-মেজাজের যে শিশুও এদের গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে পারে।

বিপদ দেখলে বন্য পশুমাত্রই হিংস্র হ'য়ে ওঠে, কিন্তু এরা নাকি গায়ে প'ড়ে মোটেই ঝগড়া করে না; অত বড় ভীষণ শরীরের সঙ্গে স্বভাবটা এদের শান্তই। ভাগ্যিস শান্ত!

কোমোডোর এই বৃহৎ টিকটিকি যে জাতের তাদের বলা হয় মনিটর। আমেরিকায় মনিটর নেই। সেখানে তাদের জায়গা যারা নিয়েছে তাদের বলা হয় ইগুয়ানা। এদের অসংখ্য জ্ঞাতিগোষ্ঠী সকলেই খাস আমেরিকান; শুধু ফিজিদ্বীপে আর মাদাগাস্কারের দু'-তিনটে পরিবার কী ক'রে কবে এসে বাসা বেঁধেছিলো সেটা একটা রহস্য।

হিংস্র হলেও মার্জিতরুচি সুসভ্য
স্বভাবে হিংস্র—তবু শিশুর কাছে যেন পোষা বেড়ালটি

এদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আছে রঙবেরঙের সুন্দর চেহারা, আছে অদ্ভুত বিবর্ণ মূর্ত্তি; খুব ছোটও আছে খুব বড়ও আছে। অবিশ্যি মনিটরের তুলনায় এদের বৃহত্তমও ছোট; কিন্তু টিকটিকির মত স্বভাবত ক্ষুদ্র জীব পাঁচ ফুট লম্বা হ'লেই প্রকাণ্ড বলতে হবে।

আকারে ছোট হ'লেও অন্য সমস্ত বিষয়েই মনিটরের চেয়ে এরা রোমাঞ্চকর। ড্র্যাগন বলতে আমাদের কল্পনায় যে অদ্ভুত ও ভীষণ জীবের ছবি ভেসে ওঠে, ইগুয়ানার স্বভাবটা না হোক্, চেহারাখানা অন্তত তার সঙ্গে খানিকটা মেলে। এদের মধ্যে সকলের আগে যাদের

কথা বলতে হয় তারা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের গ্যালাপাগস্ (Galapagos) দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা। এদের জীবনকাহিনী সত্যি বড় অদ্ভুত। প্রাগৈতিহাসিক বিরাট্ট সরীসৃপদল, বহুকাল আগেই যারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে, তাদেরই বংশধর এরা। পূর্ব্বপুরুষদের অদৃষ্ট অতিক্রম ক'রে এরা যে এতকাল টিঁকে থাকতে পেরেছে সেটাই আশ্চর্য্য। গ্যালাপাগস্ দ্বীপপুঞ্জ আসলে কতগুলো ডুবন্ত ও নিবন্ত আগ্নেয়গিরির চূড়া। এত সুদূর এত নির্জ্জন কোনো জায়গা এ-পৃথিবীতে আজকাল খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সেখানে যে শুধু মানুষ নেই তা নয়, নাম করবার মত অন্য কোনো প্রাণীই নেই, ইগুয়ানাই সেখানকার রাজা। রাশি-রাশি লাভা পাথর হ'য়ে জ'মে প'ড়ে আছে, আর চারদিকে চিরকাল আছড়ে মরছে অকূল সমুদ্র—তা-ছাড়া কিছু নেই। শুধু আছে এই অদ্ভুত টিকটিকির দঙ্গল বুঝি কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, তাদের রাজত্বে ভাগ বসাবার আর কেউ নেই। কী ক'রে যে এরা এখানে এলো, এ-নিয়ে পণ্ডিতরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। দ্বীপগুলো কি এক-এক ক'রে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে এসেছিলো? নাকি কোনোকালে আস্ত একটা দ্বীপই ছিলো, পরে ভেঙে গেছে অনেক টুকরো হ'য়ে? এমন একটা মতও আছে যে, বহু আগে দক্ষিণ আমেরিকার খানিকটা সমুদ্রের তলায় ধ্ব'সে যায়, তারই খণ্ড খণ্ড অংশ এই দ্বীপগুলো। এম্‌নি কোনো একটা ফিকিরে এই অতি প্রাচীন জীব অনেক আগেই নির্ব্বংশ না হ'য়ে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে।

গ্যালাপাগস্-এর ইগুয়ানা আমেরিকার টিকটিকিদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব এদের আছে যা পৃথিবীর আর কোনো টিকটিকির নেই—এরা জলচর। এককালে জীবমাত্রেই জলচর ছিলো, কোনো স্থল বলতে গেলে তখন ছিলোই না। তারপর অনেক

জানোয়ারই ডাঙায় জায়গা ক'রে নিয়েছে; তবু এটা দেখা গেছে যে, কেউ-কেউ জীবন-সংগ্রামের দুর্দ্দান্ত পীড়নে স্থল থেকে আবার জলেই গেছে ফিরে। এই সামুদ্রিক ইগুয়ানারা তাদেরই দলে। প্রথমটায়, এদের সমুদ্রে সাঁৎরাতে দেখে অনেকে ভেবেছিলেন এরা বুঝি যাচ্ছে মাছ খেতে। কিন্তু এরা সম্পূর্ণই নিরামিষ-ভোজী, সমুদ্রের লতাপাতা ছাড়া কিছু খায় না, যদিও চেহারাখানা মোটেই বৈষ্ণব নয়।

সামুদ্রিক গোসাপ (ইগুয়ানা)
চেহারাটা খোঁচা খোঁচা, অসভ্য, কর্কশ, কিন্তু মেজাজটা ভালো

প্রাণিতত্ত্বের গবেষণায় ডারুইন গ্যালাপাগস্ দ্বীপ-পুঞ্জে অনেক দিন কাটান। সামুদ্রিক ইগুয়ানার প্রথম বিস্তৃত বর্ণনা তাঁর বইতেই পাওয়া যায়। লম্বায় এরা চার পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত হয়। সাঁৎরাবার সুবিধের জন্য এদের লেজটা চ্যাপ্টা, মাথায় খোঁচা-খোঁচা আঁশ, আর শিরদাঁড়ার উপরে সারি-সারি কাঁটা বসানো। ভাঁটার সময় জল ক'মে গেলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ ডাঙায় প'ড়ে থাকে, তখন যতটা পারে এরা খেয়ে নেয় বটে, কিন্তু দরকার হ'লে গভীর জলে যেতেও এরা পরোয়া করে না। ডুব দিয়ে এরা যে অনেকক্ষণ থাকতে পারবে, সেটা তো স্বাভাবিকই; কিন্তু সে-অনেকক্ষণ যে সত্যি কতক্ষণ, তা শুনলে অবাক্ হবে!

ডারুইনের 'বীগ্‌ল্‌' জাহাজের এক খালাসি কতগুলো সামুদ্রিক ইগুয়ানাকে ধ'রে নিয়ে চলেছিলো, তার সখ হ'লো একটাকে মারবে। জলে ডুবিয়ে মারাই সবচেয়ে সহজ মনে ক'রে সে ওর গলায় ভারি ওজন বেঁধে দিলে সমুদ্রে ডুবিয়ে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর ওকে টেনে তুলতে দেখা গেলো যে মরা দূরে থাক্‌, একটু কাহিল পর্য্যন্ত হয়নি।

গ্যালাপাগস্‌ যেন পৃথিবীর বাইরে, সেখানে যেন পৃথিবীর কোনো অতীত যুগ দৈবক্রমে চিরকালের মত র'য়ে গেছে। সেখানে এই সামুদ্রিক ইগুয়ানা গরম লাভা-পাথরের উপর শুয়ে-শুয়ে সারাদিন রোদ-পোহায়, আর রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে এরা পাথরেরই কোনো কোণে-ঘুপটিতে। জীবিকার জন্য এদের প্রতিযোগিতা নেই কারো সঙ্গে, প্রচণ্ড কোনো শত্রুর ভয় নেই; নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় গা মেলে দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী এরা কাটিয়ে দিলে। চেহারাটা এদের গল্পের ড্র্যাগন-তুল্য হ'লেও মেজাজটা ভারি ঠাণ্ডা; কিছুতেই কামড়ায় না। কোনোরকম ভয় পেলে এরা জল ছেড়ে তক্ষুনি দৌড় দেবে ডাঙায়, তখন আর জলে নামবে না কিছুতেই। তার কারণ এই যে, ডাঙায় এদের কোনো শত্রুই নেই, আর জলে আছে হাঙর। হাঙরের পেটে মাঝে-মাঝে এরা গেছেই, জলটাকেই তাই ভয় করতে শিখেছে। ডাঙায় মানুষ নামক ভয়ঙ্কর জানোয়ারটি দেখা দিয়েছে অতি অল্পদিন, তাই চিরকাল থেকে ডাঙাকেই এরা চরম আশ্রয় ব'লে জেনেছে।

এই শূন্য লাভা-দ্বীপগুলির দৃশ্যের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে এরা। লাভা-পাথরেরই মত কালো এদের রঙ, তেমনি শক্ত খোঁচা-খোঁচা চেহারা—দেখলে মনে হয় এরা যেন এদের পারিপার্শ্বিকেরই একটা অংশ। ডারুইন যখন প্রথম এদের দেখেন তখন সমস্ত দ্বীপগুলো ভ'রে হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে ছিলো এরা; বিংশ শতাব্দীর প্রথম

দিকেও এরা ছিলো অগুন্‌তি, কিন্তু এরই মধ্যে এরা অনেকটা ক'মে গেছে। মানুষ পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই এদের আয়ু শেষ হ'লো বুঝি। এইবার আস্তে-আস্তে এরা লোপ পাবে ; এতদিনে শেষ হ'লো এদের দিন।

এই আশ্চর্য্য টিক্‌টিকিকে কখনো কোনো চিড়িয়াখানায় দেখা যাবে এমন আশাই নেই। বন্দী অবস্থায় এরা মোটে কিছু খাবেই না। না-খেয়ে এরা থাকতেও পারে দীর্ঘকাল। আমেরিকার প্রফেসর উইলিয়ম বীব কয়েকটাকে জ্যান্ত ধ'রে আনতে পেরেছিলেন নিউ ইয়র্কে। জাহাজে এক হাজার মাইল রাস্তা এরা শ্রেফ লোনা জল আর হাওয়া খেয়ে ছিলো, তার পরেও দু'মাস কিছু খায়নি। এই অতি দীর্ঘ উপবাসেও এদের স্বাস্থ্যের কি ফুর্ত্তির এতটুকু হানি হয়নি!

সামুদ্রিক ইগুয়ানার রাজত্ব সমুদ্রের তীরেই শেষ। দ্বীপগুলোর ভিতরের দিকে এদের এক জাতভাইয়ের আস্তানা, তাদের বলা যায় ডাঙার ইগুয়ানা। এদের চেহারার ছাঁচটা মোটামুটি এদের সামুদ্রিক ভাইদেরই মত ; তবে আকারটা একটু ছোট, আর রঙটা আলাদা। হল্‌দে কম্‌লালেবু আর লাল্‌চে মিশিয়ে বড় সুন্দর এদের গায়ের রঙ। দেখতে সুশ্রী বটে, কিন্তু মেজাজখানা এদের বড় সুবিধের নয়, দরকার বোধ করলে দাঁত আর নখ দুটোই নাকি চালাতে পারে। তবে বন্দী অবস্থায় আহারাদি করতে আপত্তি নেই ব'লে এদের চিড়িয়াখানায় রাখা অসম্ভব নয়।

এই জাতের মধ্যে সবচেয়ে জমকালো বোধ হয় শিঙওয়ালা গণ্ডার-ইগুয়ানা। ওয়েস্ট্‌ ইণ্ডিজ্‌-এর হাইতি আর পোর্টো রিকো দ্বীপের বাসিন্দা এরা। ছাইরঙের মজবুত শরীর, মস্ত মাথা, চওড়া হাঁ, গলার কাছ থেকে একটা থলে ঝুলছে, গায়ের চামড়াটা ঢিলে আলগা মত—পিঠের উপর সারি-সারি কাঁটা বসানো—একটি মূর্ত্তিমান

উৎপাত যেন। নাকের উপর তিনটে ভোঁতা শিঙ আছে ব'লে এদের নাম হয়েছে গণ্ডার।

বন্দী থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু এদের ধরাই শক্ত। একে তো এরা ঐ দুটি ছোট দ্বীপেই আবদ্ধ, তা ছাড়া, এরা মাটির তলায় গভীর সুরঙ্গ খুঁড়ে সেখানে বাসা বাঁধে। পাথরের তলাতেও চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত এদের গর্ত্ত পাওয়া গেছে। আর সেই গর্ত্ত থেকে এদের বার করা বড় সোজা কথা নয়। সমস্ত ইগুয়ানা জাতটার মধ্যে এদের প্রকৃতিটাই খানিকটা হিংস্র। এদের পিছনে মানুষ যে-শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেয়, তাকে তেড়ে আসতেও এরা ভয় পায় না। তাই ব'লে আদর-যত্ন পেলে এরা যে মানুষের বশ না হয় তাও নয়।

আজানু-লম্বিত বাহু

বোর্ণিও দ্বীপের অধিবাসী বানর

নয়

ছাঁচের তফাৎ

আমাদের নিজেদেব ধাঁচের প্রাণীও প্রকৃতির খেয়ালে অদ্ভুত সব রূপ নিয়েছে। সব দেশে মানুষের শরীরের মূল গড়ন এক কিন্তু চেহাবা ও রক্তের পার্থক্যে এবং আকারের তারতম্যের দরুণ নানারকম দেখায়, তার ওপর বেশভূষা নানা বকম হওয়ার দরুণ সবশুদ্ধ জড়িয়ে প্রত্যেকে আলাদা হ'য়ে গেছে। প্রাণি-জগতে এর চেয়ে বড় বড় সব পরিবর্ত্তন হয়েছে। একই প্রাণী একটি মূলধারা থেকে বেরিয়ে নানা রকম অদ্ভুত ছাঁচ নিয়েছে।

সাধারণ প্রাণীর অনেক সময়ে অদ্ভুত আকারের বাচ্চা হওয়াব খবর আমরা পাই। অনেক শিশু বিকলাঙ্গ অদ্ভুত চেহারার হয়ে জন্মায়, তাদেব কেউ-কেউ বেঁচেও থাকে। এগুলি আকস্মিক। হঠাৎ এক-আধটা মূল-ধারা থেকে ছিটকে এই রকম বিকৃত হয়ে যায়।

কিন্তু প্রাণি-জগতে এক একটি জীবের সমস্ত ধারাই নানা অদ্ভুত ছাঁচের হ'য়ে গেছে। কেন যে হয়েছে কোনো কোনো সময়ে বিচার ক'রে দেখে বলতে পারি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হদিস ঠিক কোনো কোনো প্রাণীর আবেষ্টনের পরিবর্ত্তনের দরুণ, শিকার ধরবার হাত থেকে পালাবার সুবিধের জন্যে নানারকম ভাবে দেহের হয়েছে। কোন কোন পরিবর্ত্তনের মানে ঠিক পাওয়া যায় না।

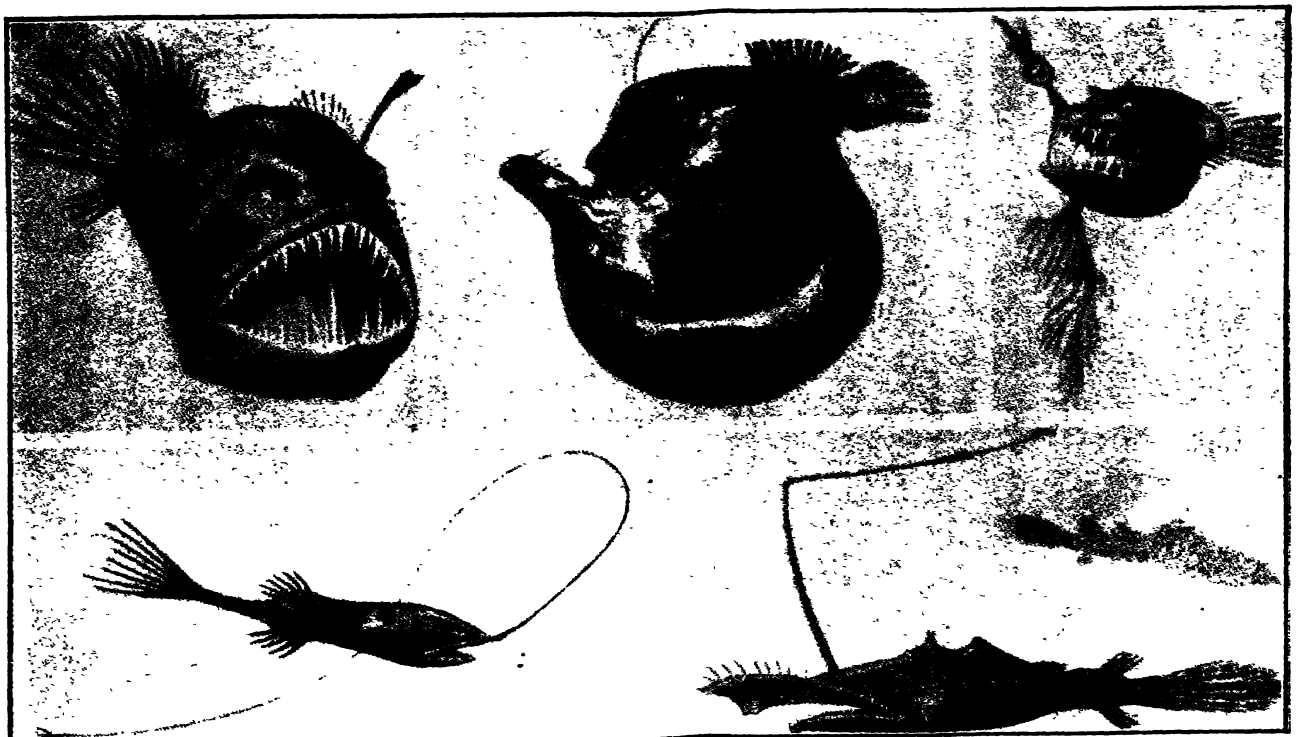

সমুদ্রের ছিপ্-শিকারী মাছ

নিজের চেয়ে বড় শিকার জলযোগ ক'রে কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে
উপরের মাঝের ছবিতে দেখ

সমুদ্রেব কতকগুলি অদ্ভুত মাছের কথা বলি। আগের পাতায় তাদের ছবি দেখেই বোঝা যাবে কী কিম্ভূত-কিমাকার তাদের রূপ। এ ধরণের মাছ প্রকৃতিব্য আকস্মিক কোনো খেয়ালে হঠাৎ একটি কোথাও জন্মায়নি। এদেব গড়নই এই বকম।

আমবা মাছ শিকাব কবি ছিপ দিয়ে কিন্তু মাছেরা আবার ছিপ দিয়ে শিকার করে এমন কথা শুনলে অবাক লাগে না? এই মাছগুলি কিন্তু সত্যিই তাই কবে। এদেব মাথাব সামনে থেকে যে চাবুকের মত লম্বা জিনিষটি বেবিয়েছে এইটিই এবা ছিপেব মত ব্যবহার করে। এই ছিপ দেখিয়ে প্রলুব্ধ ক'বে এবা শিকাব ধরে। শিকারকে একবার নাগালেব মধ্যে পেলেই হ'ল, তাব কি আকাব তা এরা গ্রাহ্য করে না। বাগে পেলে নিজেব চেযে বড় মাছকেও অনায়াসে এরা উদরসাৎ ক'রে ফেলে। পেটেব চামড়া এদেব ববাবেব মত টানলেই বাড়ে। নিজের চেয়ে বড শিকাব জলযোগ ক'বে একটি মাছেব কি অবস্থা হয়েছে ছবিতেই টেব পাওয়া যাবে।

এই ছিপ-শিকাবী মাছেব দুটি শ্রেণী আছে। একটি শ্রেণী অগভীব সমুদ্রের তলায থাকে। আব একটি শ্রেণী থাকে গভীর সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায়। ছ' হাজাব ফিট নিচের জলেও এদের দেখা পাওয়া যায়। সেখানে সূর্য্যেব আলো যায় না। কিন্তু সেই চির অন্ধকার রাজ্যে তাই ব'লে কোন অসুবিধে এ সব মাছেব হয় না। সেখানকার অন্যান্য অনেক প্রাণীব মত এই মাছদেব গা থেকেও একরকম আলো বেরোয়। তাদেব ছিপটির ডগাটি বিশেষ একটি রঙিন আলোর।

মাছেদেব ছেড়ে বাঁদরদের রাজ্যে যাওয়া যাক্। বাঁদরদের ভিতর নানা রকম অদ্ভুত চেহাবা চোখে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যামাজন নদীর মোহানাব কাছে একধবণেব বাঁদর থাকে। মুখটা তার ঠিক একটি

ঋষি-বানব

মুখখানা ধব্‌ধবে সাদা, বুড়োপানা গম্ভীর, কত চিন্তাকুল।
দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী

খাঁদা বানব

অপরূপ রূপ! চীন ও তিব্বতের অধিবাসী

মোটা-সোটা বুড়োর মত। চীন ও তিব্বতে খাঁদানাক এক ধরণের বাঁদর দেখা যায়। দেখলে মনে হবে যেন বাঁদরের ব্যঙ্গ চিত্র। চিড়িয়াখানায় বেবুন ম্যানড্রিল যারা দেখেছে তারা জানে বাঁদরের চেহারা কতদূর বীভৎস হ'তে পারে।

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত প্রাণী বাঁদরের মধ্যে নয়, শূওরদের রাজ্যে পাওয়া যায়। শূওর গালাগালটা সত্যি দেওয়া খারাপ। পৃথিবীর পরম কুৎসিত প্রাণীটির নাম ওয়ার্টহগ অর্থাৎ আঁচিলময় শূওর। এদের বাড়ি আফ্রিকায়।

জানোয়ারটি ছোটখাট নয়। ধাড়ি হ'লে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু হয়। এক-একটির ওজন হয় প্রায় আড়াই মণেরও বেশি। এদের পিঠে ও শিরদাঁড়ার কাছে একরকম লম্বা কেশর বেরোয়, গায়ের চামড়ায় কিন্তু লোম নেই, হাতির দাঁতের মত দুজোড়া বাঁকানো দাঁত এ-মুখের দুধারে বেরোয়।

হায় হায়! হাতীর মত দাঁত ও সিংহের মত কেশর থেকেও এ জানোয়ার পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত ব'লে গণ্য হ'লো, এ বড় দুঃখের কথা নিশ্চয়!

এরা নিশাচর জীব। রাত্রে বেরোয় খাবারের খোঁজে। খাবার সাধারণত গাছের মূল ছাড়া কিছু নয়। দিনের বেলায় এরা জঙ্গলের ভিতর কিংবা উইখেকো কোন আর্ডভার্কের গর্তে আশ্রয় নেয়।

এই উইখেকো 'আর্ডভার্ক' আর একটি অদ্ভুত প্রাণী। এদের বংশে কারুরই সামনের দাঁত নেই, কারুর কারুর দাঁত একেবারেই থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা এদের 'এডেন্টাটা' নামে এক শ্রেণীতে ফেলেছেন। শব্দটি সবদিক্ দিয়েই দাঁতভাঙা, কারণ তার মানে হ'লো সোজা কথায় 'ফোক্‌লা'। এই ফোক্‌লা জানোয়ারদের জ্ঞাতগোত্র হ'ল দক্ষিণ আমেরিকার শ্লথ্ ও পৃথিবীর সব জায়গার উইখেকোরা।

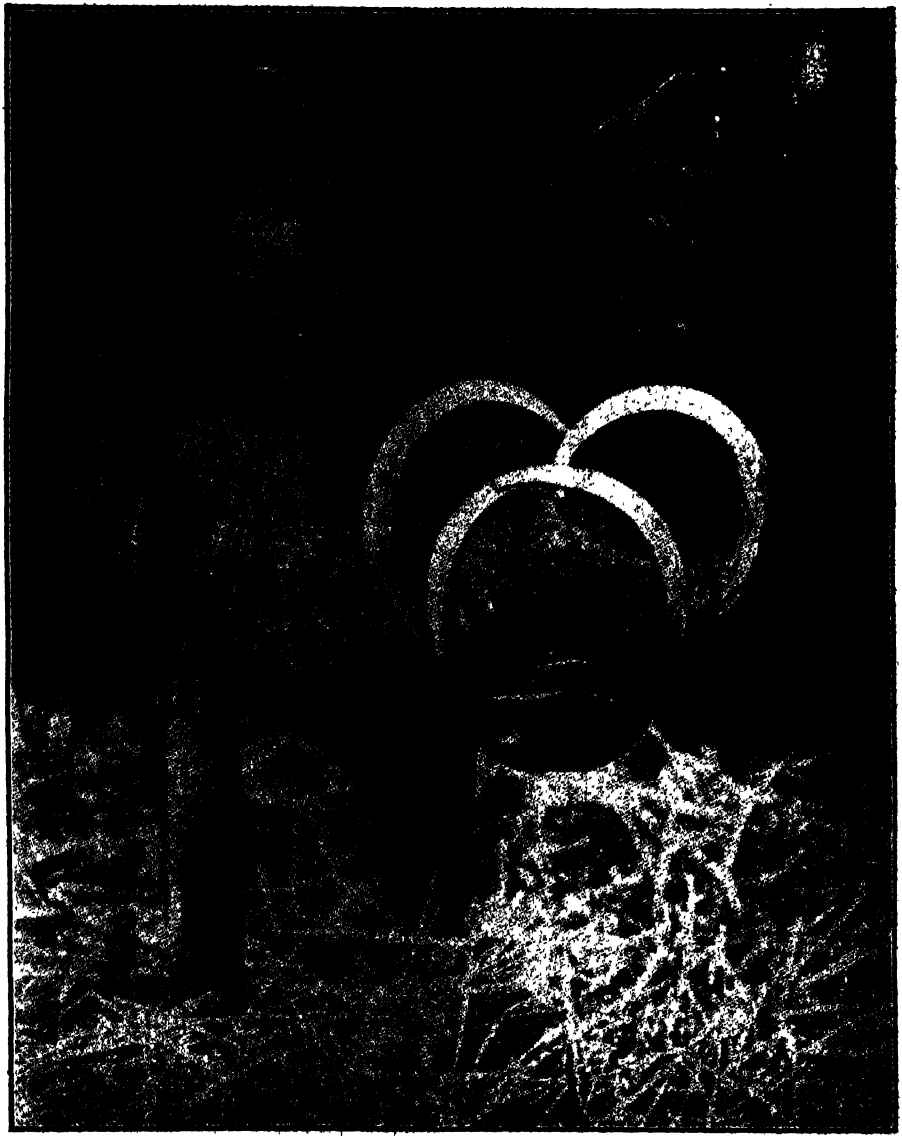

'ওয়ার্ট হগ্' (আঁচিলময় শূকর)

দেহের গঠন, দাঁতের ধরণ ও সুন্দর নয়নে, বোধ হয় সবচেয়ে মনোরম

আজগুবি জানোয়ার

চেহারা এদের অদ্ভুত ধরণের হয়। আর্ডভার্ক জানোয়ারটি কুৎসিত হ'বার দিক্ দিয়ে প্রায় ওয়ার্ট হগের কাছাকাছি। লম্বায় জানোয়ারটি প্রায় ছ'ফুট হবে। লম্বা মাথার সামনে লম্বা নাক, কানগুলি গর্দ্দভকেও লজ্জা দেয়। ভারি ভারি মোটা বেঁটে পা, আর সে পায়ে নখওয়ালা থাবা। এই থাবা দিয়েই সে দিনের বেলায় আশ্রয়ের জন্যে মাটিতে গর্ত্ত খোঁড়ে।

'আর্ডভার্ক'—উইখেকো

চেহারাটি এমন দুষমনের মত হ'লে কী হয়—আর্ডভার্ক পিঁপড়ে এবং উই ছাড়া আর কিছু খায় না। অবশ্য লম্বা জিভ দিয়ে চেটে এক-এক গরাসে মুড়ি মুড়কির মত বড় অল্প আহার এঁর পেটে যায় না।

পশুরাজ্যের সবচেয়ে আজব জানোয়ার হল 'স্লথ্'। নামটা এদের ঠিকই দেওয়া হয়েছে, কারণ এমন আলসে প্রাণী আর দুটি নেই। একেবারে পিপু ফিস্থুর দাদা। তবে শুয়ে এরা থাকে না। এদের বিশ্রাম হ'লো ভারি মজার—গাছের ডাল থেকে নিচের দিকে পিঠ ক'রে এঁরা রাতদিন ঝুলে থাকেন। তাতেই এঁদের নাকি ভারি আরাম। মাটির উপর এরা চলতে পারে না বললেই হয়। এদের পিঠের লোমগুলি সাধারণ জানোয়ারের ঠিক উল্টো দিকে, খুব ঘন হ'য়ে এই মোটা কর্কশ লোম তাদের গা ছেয়ে থাকে। বৃষ্টিতে এ লোম খুব ভালো ওয়াটারপ্রুফের কাজ করে,

তা বোধ হয় বোঝাই যাচ্ছে। এদের এই আলসেমি ও এদেব ছোট্ট হাঁ দেখে আগে অনেকের ধারণা ছিল এবা ধূলো বাতাস ছাড়া কিছুই খায় না। কিন্তু অমন মহাপুরুষ এরা নয়। গাছেব কচি ডগা, পাতা ও ফল এরা খেয়ে থাকে।

কিন্তু এই ফোক্‌লা বংশের সবাই কুৎসিত নয়। সবচেয়ে বড় উইখেকো জানোয়ারকে দেখতে সত্যিই ভালো। গাময় এদেব বড় বড় ঝাঁকড়া লোম; ন্যাকটি প্রকাণ্ড লম্বা আর লেজটি বিশাল একটি চামরের মত। লেজের এক একটি লোম লম্বায় ষোল ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। ঘুমোবার সময় এরা লেজটি গায়ে কম্বলের মত চাপা দিয়ে শোয়।

ধাঁচে ও ছাঁচে যারা আজগুবি সেবকম জানোয়াব সংখ্যায় বড় কম নয়। এখানে তাদের কয়েকটির মাত্র পবিচয় দেওযা হ'লো।

আমাদের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বই

শনিবারের বিকেল—শ্রীবুদ্ধদেব বসু	...	॥৵০
রক্ত-বাদল ঝরে—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৲
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা—শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত	...	॥৵০
বিজ্ঞানের বিস্ময়—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	...	॥০
রাজর্ষি অশোক—শ্রীপ্রমথনাথ সেন	...	॥৵০
ছিটে-ফোঁটা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	...	৸০
বিহার-ভূকম্প —শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	...	॥০
জানোয়ারদের যুদ্ধযাত্রা—শ্রীইন্দুভূষণ রায়	...	॥০
দেবতার রোষ—শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	...	।৴০
ভূ-পর্য্যটন—ডাঃ শরৎচন্দ্র বসাক	...	২৲
অসম্ভবের দেশে—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	১৲
গৌতম-বুদ্ধ—শ্রীত্রিভঙ্গ রায়	...	৸০
মাখন দেঁড়ে—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥৵০
মহাভারতী (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	...	১।০
রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল্ (অনুবাদ)—শ্রীপ্রমথনাথ সেন	...	॥০
ছত্রপতি শিবাজী—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার	...	॥৵০